ইতিহাস



(প্রাচীন)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ইতিহাস

(প্রাচীন)

(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ

প্রথম সংস্করণ

মে ১৯৯৪

পুনর্মুদ্রণ—ডিসেম্বর ১৯৯৪
পুনর্মুদ্রণ—১৯৯৫

প্রকাশক
শ্রী উজ্জ্বল বসু,
সচিব, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১৬

বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

।। ভূমিকা ।।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এতাবৎকাল মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে। এই ধারা অনুসরণ করেই পর্ষৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী 'ইতিহাস' পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করছে।

জীবজগতে মানুষের আবির্ভাব শেষে হলেও বেঁচে থাকার জন্য তাকে ক্রমাগত কঠোর শ্রম করতে হয়েছে দলবদ্ধভাবে। ইতিহাস মানুষের দলবদ্ধ শ্রম--তাদের নানা কীর্তি ও ভাঙ্গাগড়ার সাক্ষী। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষের এই অতীত কাহিনী সরল ভাষায় শেখানোই পর্ষদের উদ্দেশ্য। ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষকবৃন্দের সমবেত যত্ন ও প্রচেষ্টায় এই বছরই প্রথম ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এই বই তুলে দেওয়া সম্ভব হল। প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও চিত্র যথাসাধ্য যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের কাছে অনুরোধ,. তাঁরা যেন পঠন-পাঠনের সময়ে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনুশীলনী দেখে আরো কিছু অনুশিলনী প্রস্তুত করে নেন।

পরিশেষে, নিবেদন এই যে, যথেষ্ট যত্ন ও সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। গ্রন্থটিকে আগামী দিনে আরও সুন্দর করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী সুধীজনের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ পর্ষৎ কর্তৃক সমাদৃত হবে।

৭৭/২, পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা-১৬
৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

সূচীপত্র

ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

বাৎসরিক পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা

১ম পর্ব

মে — আগষ্ট

মোট কার্য দিবস- ৭২ দিন

খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কাজকর্ম- ৫ দিন

ন্যূনতম পঠনপাঠন দিন- ৬৭

বিষয়ে ন্যূনতম পঠনপাঠন পিরিয়ড- ৩৩

(সপ্তাহে ৩ পিরিয়ড)

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১) আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?	ক) আদিম মানুষের অসহায় অবস্থা খ) শ্রম ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষের অগ্রগতি গ) ইতিহাস কি ও কেন পড়ি।	২ ১	৩	এই এককে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহজ আলোচনা, গল্প ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখাবার চেষ্টা করবেন।
২) প্রাচীন সভ্যতার কথা কেমন করে জানা যায়?	ক) বহু নিদর্শন- কেন হারিয়ে গেছে। খ) নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের অবদান।	১ ২	৩	বিদ্যালয়ের মোট কার্যদিবস অবস্থা অনুসারে হেরফের হতে পারে।
৩) আদিম যুগের মানব	ক) আদিম মানব ও তাদের পরিচয় খ) তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি- খাদ্য	২	২	এ পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা অনুসারে ও পরিবর্তন হতে পারে। শিক্ষক-
৪) প্রাচীন প্রস্তর যুগ	ক) সময়কাল খ) হাতিয়ার ও জীবন যাপন	২	২	শিক্ষিকাগণ মাঝে মাঝে ছোট ছোট লিখিত কিংবা মৌখিক পরীক্ষা নিতে পারেন।

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৫) নব্য প্রস্তর যুগ	ক) সময়কাল।	১		
	খ) হাতিয়ার			
	গ) জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন।			
	(খাদ্য উৎপাদক মানুষ) কৃষিকাজ, পশুপালন,চাকা, সম্মিলিত শ্রম ও যৌথ সম্পদ, গোত্র, কৌম, ধর্মবিশ্বাস, গুহাচিত্র)	৪		
৬) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ	ক) ভূমিকা		৫	
	খ) নগরের উদ্ভব।			
	গ) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন।	১		
	ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য			
	ঙ) সামাজিক পরিবর্তন			
	চ) জাতি গোষ্ঠী বিরোধ			
	ছ) রাষ্ট্রে বিরোধ	১		
	জ) নদীমাতৃক সভ্যতার কারণ	১	৩	
৭) মেসোপটেমিয়া সভ্যতা	ক) অবস্থান ও প্রাচীনত্ব			
	খ) ভূমির উর্বরতা ও ফসল			
	গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১		
	ঘ) পেশা			
	ঙ) স্থাপত্য ও শিল্প			
	চ) ধাতুশিল্প	১		
	ছ) পরিবহন ও বাণিজ্য			
	জ) লিপি	১	৩	
৮) মিশরীয় সভ্যতা	ক) অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি			
	খ) ফ্যারাও ও পুরোহিত			
	গ) লিপি	২		
	ঘ) কর্মচারী			
	ঙ) সেনাবাহিনী			
	চ) ব্যবসা বাণিজ্য			
	ছ) পিরামিড ও মমি	২		

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	জ) ধর্মীয় বিশ্বাস			
	ঝ) কৃষি ও শিল্প	১	৫	
৯) সিন্ধু সভ্যতা	ক) অবস্থান, আবিষ্কার			
	খ) নগর পরিকল্পনা	১		
	গ) ব্যবহৃত জিনিসপত্র			
	ঘ) জীবিকা			
	ঙ) ব্যবসা বাণিজ্য	১		
	চ) ধর্মবিশ্বাস			
	ছ) শ্রেণীবিভাগ ও সীলমোহর			
	জ) ধ্বংসের কারণ	১	৩	
১০) শ্রেণীতে ইতিহাস বিষয় সম্পর্কিত কর্মোদ্যোগ	ক) বিতর্ক/ বক্তৃতা			
	খ) অনুচ্ছেদ লিখন			
	গ) সংবাদপত্র পাঠ			
	ঘ) নমুনা সংগ্রহ ও প্রদর্শনী	৪	৪	পর্বের বিভিন্ন মাস ও পিরিয়ডে এই সব স্ব-শিখন কাজকর্ম চলবে।
	ঙ) মানচিত্র পঠন			
	চ) পরিবেশের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা।			

২য় পর্ব

সেপ্টেম্বর — ডিসেম্বর

মোট কার্য দিবস — ৬৮ দিন

খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কাজকর্ম — ৪ দিন

ন্যূনতম পঠনপাঠন দিন — ৫৪

বিষয়ে ন্যূনতম পঠনপাঠন পিরিয়ড — ২৭

ষাণ্মাসিক পরীক্ষা — ১০

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১১) চীন সভ্যতা	ক) আদি সভ্যতা			
	খ) উপকথা			
	গ) রাজবংশ	২	২	
১২) নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য	ক) ভূমিকা			
	খ) কৃষি			
	গ) শিল্প ও বাণিজ্য	১		
	ঘ) ধর্ম			
	ঙ) লিপি	১	২	
১৩) লৌহ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন	ক) আবিষ্কার			
	খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন।	২		
	গ) রাজশক্তির উদ্ভব।		২	
১৪) ব্যাবিলন	ক) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা			
	খ) অবস্থান ও কৃষি	২		
	গ) ধর্ম ও পুরোহিত			
	ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি	১		
	ঙ) হামুরাবি			
	চ) সমাজ	১	৩	
১৫) মিশর সাম্রাজ্য	ক) হিকসস্‌দের মিশর আক্রমণ			
	খ) সাম্রাজ্য বিস্তার			
	গ) পুরোহিত শ্রেণী			
১৬) ইরান	ক) সাম্রাজ্যের উত্থান ও শাসনব্যবস্থা	৩	৩	
	খ) জরাথুস্ত্রের ধর্মমত			
১৭) ইহুদি জাতি	ক) আদি বসতি	২	২	
	খ) মিশরে বসবাস			

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	গ) মোজেস			
	ঘ) ধর্মবাণী			
	ঙ) রাজ্য স্থাপন	২	২	
১৮) গ্রীস	ক) ঈজিয়ান সভ্যতা			
	খ) ইলিয়াড ও ওডিসি।			
	গ) রাজনৈতিক জীবন	১		
	ঘ) সামাজিক জীবন ও ধর্ম			
	ঙ) নগররাষ্ট্র			
	চ) উপনিবেশ স্থাপন	১		
	ছ) এথেন্স	১		
	জ) স্পার্টা	১		
	ঝ) এথেন্স ও স্পার্টা			
	ঞ) পেরিক্লিস			
	ট) নাটক, ইতিহাস, সঙ্গীত			
	ঠ) সক্রেটিস			
	ড) শিল্পকলা	২		
	ঢ) ম্যাসিডোনিয়া			
	ণ) আলেকজান্ডার			
	ত) পতন	১	৬	
১৯) রোম	ক) অবস্থান			
	খ) আদি ও প্রস্তর যুগে ইতালী।			
	গ) রাজতন্ত্রের বিলোপ ও প্রজাতন্ত্র			
	ঘ) রাজতন্ত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা	১		
	ঙ) ইতালীতে রোমের প্রভুত্ব			
	চ) রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ	১	২	
	ছ) ক্রীতদাস ও বিদ্রোহ			
২০) শ্রেণীতে ইতিহাস বিষয় সম্পর্কিত কর্মোদ্যোগ	১ম পর্বের অনুরূপ ইত্যাদি।	৩	৩	

৩য় পর্ব

জানুয়ারি — এপ্রিল

মোট কার্য দিবস — ৯০ দিন

ন্যূনতম কার্যদিবস — ৪৫ দিন

বিষয়ে ন্যূনতম পঠনপাঠন পিরিয়ড — ২৩

মাধ্যমিক পরীক্ষা — ১০

উঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা — ১৫

বাৎসরিক পরীক্ষা — ১০

বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরী

ও ফলাফল প্রকাশ — ১০

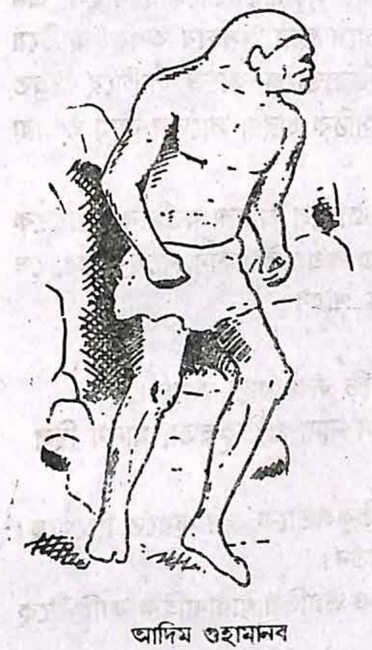
একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১৯) রোম	ক) সাধারণতন্ত্র পতনের প্রাক্কালে রোমের অবস্থা খ) জুলিয়াস সীজার গ) রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও অগাষ্টাস	১		যেসব বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হয়না সেখানে এ বিষয়ে পিরিয়ড সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সেই মত পঠনপাঠন ও অন্যান্য কাজকর্ম চালাতে হবে।
	ঘ) সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পতন ঙ) খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান।	১	২	
২০) চীন	ক) শাঙ বংশ খ) চৌ বংশ	১		
	গ) কনফুসিয়াস	১	২	
২১) প্রাচীন ভারত	ক) আর্যদের পরিচয় খ) বেদ গ) জাতিভেদ প্রথা।	১		
	ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন। ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য চ) চতুরাশ্রম	১		
	ছ) প্রতিবাদী আন্দোলন জ) মহাবীর ঝ) বুদ্ধ	২	৪	
২) মৌর্য বংশ	ক) ষোড়শ মহাজনপদ ও মগধ			

একক	উপএকক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার	১		
	গ) অশোক	১	২	
২৩) কুষান বংশ	ক) ভূমিকা			
	খ) কণিষ্ক	২	২	
২৪) গুপ্ত বংশ	ক) ভূমিকা			
	খ) সমুদ্রগুপ্ত			
	গ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত	২	২	
২৫) প্রাচীন বঙ্গদেশ	ক) প্রাচীন ইতিহাস।			
	খ) শশাঙ্ক			
	গ) কৃষি, বাণিজ্য ও আচার আচরণ	১	১	
২৬) ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক	ক) ভূমিকা			
	খ) মধ্য ও দঃ পূঃ এশিয়া।			
	গ) চীন			
	ঘ) আফগানিস্তান	১	১	
	ঙ) আরবদেশ			
২৭) বৈদেশিক বিবরণ	ক) ভূমিকা			
	খ) গ্রীসের পর্যটক	১		
	গ) রোমের পর্যটক			
	ঘ) চীনের পর্যটক		১	
২৮) প্রাচীন ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান	ক) ভূমিকা			
	খ) শিক্ষাকেন্দ্র			
	গ) সাহিত্য, কাব্য, মহাকাব্য	১		
	গ) গণিত ও বিজ্ঞান			
	ঘ) শিল্পকলা	১.	২	
২৯) শ্রেণীতে ইতিহাস বিষয় সম্পর্কিত কর্মোদ্যোগ	১ ম পর্বের অনুরূপ ইত্যাদি		৪	

।। প্রথম অধ্যায় ।।

● আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ●

জীবজগতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে। প্রথম অবস্থায় মানুষের আকৃতি আজকের মত ছিল না। মানুষের জীবনধারণের ধরনও ছিল ভিন্ন। আবার, প্রাকৃতিক পরিবেশে ছিল নানা বাধা-বিপত্তি বা প্রতিকূলতা। বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত, তুষারপাত—এইসব বাধা-বিপত্তির মুখে মানুষ ছিল শিশুর মতই অসহায়। তাছাড়া, প্রতি মুহূর্তে ছিল হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের ভয়। বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট খাদ্যের অভাব ছিল।



আদিম গুহামানব

এইসব বাধা-বিপত্তিকে মানুষ ভয় পেলেও হার মানে নি। প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য মানুষ তার শ্রমকে কাজে লাগিয়েছে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষ দলবদ্ধ হয়েছে। আত্মরক্ষার সংগ্রাম করতে নানা উপায় আয়ত্ত করেছে। জীবজগতের অন্য সব প্রাণীর সঙ্গে তুলনায় এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রমের ফলে মানুষের দলবদ্ধ জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য মানুষ নানারকম হাতিয়ার তৈরি করতে শেখে। ফসল বুনতে ও বন্যপশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে শেখে। পোশাক তৈরি, চাষ-আবাদ, বাড়িঘর তৈরি করতে শেখে। অসময়ের জন্য ফসল সঞ্চয় করতেও শেখে। শ্রমের ফলে মানুষ যেমন তার পরিবেশকে বদলায়, তার আকৃতি-প্রকৃতিও বদলে যায়। দলবদ্ধ শ্রমের ফলেই আসে ভাষা ও লিপির ব্যবহার। কারিগরী, শিল্প, ধর্ম,

আইন-কানুন, যুদ্ধবিগ্রহ, আমোদ-প্রমোদ, উৎসব ইত্যাদি মানব সমাজের অঙ্গ হয়ে ওঠে। মানব সমাজের এই সব বিভিন্ন দিককে এক কথায় বলা হয় মানব সভ্যতা। মানুষের সভ্যতা সব সময় সমানভাবে চলে না নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে। মানব সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক এই অগ্রগতির কাহিনীকে বলা হয় ইতিহাস।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানব সভ্যতার সূচনা কিভাবে হয়েছিল, শ্রম আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কিভাবে তার অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিল, কেমন করে মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত সমাজ গড়ে তুললো—এই সব বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভের জন্য আমরা ইতিহাস পড়ি।

মানব সভ্যতার অতীত সঠিকভাবে জানলে আমরা বর্তমান সমাজকে বুঝতে পারবো। ভবিষ্যৎ মানব সমাজের অগ্রগতি কোন পথে সম্ভব, সে শিক্ষাও আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারব।

● কী শিখলে ●

- জীব জগতে মানুষের আবির্ভাব কুড়ি লক্ষ বছর আগে।
- প্রথম অবস্থায় মানুষের জীবনে ছিল নানা প্রতিকূলতা, মানুষ ছিল খুবই অসহায়।
- বুদ্ধি আর শ্রম দিয়ে মানুষ তার প্রতিকূলতাকে জয় করতে শিখেছে। দলবদ্ধ জীবনে এনেছে নানা পরিবর্তন।
- মানব সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন ও উন্নতির ধারাবাহিক কাহিনীকে বলা হয় ইতিহাস।
- মানব সভ্যতার অতীত ও বর্তমানকে জানতে এবং ভবিষ্যতের উন্নতির পথ খুঁজে পেতে আমরা ইতিহাস পড়ি।

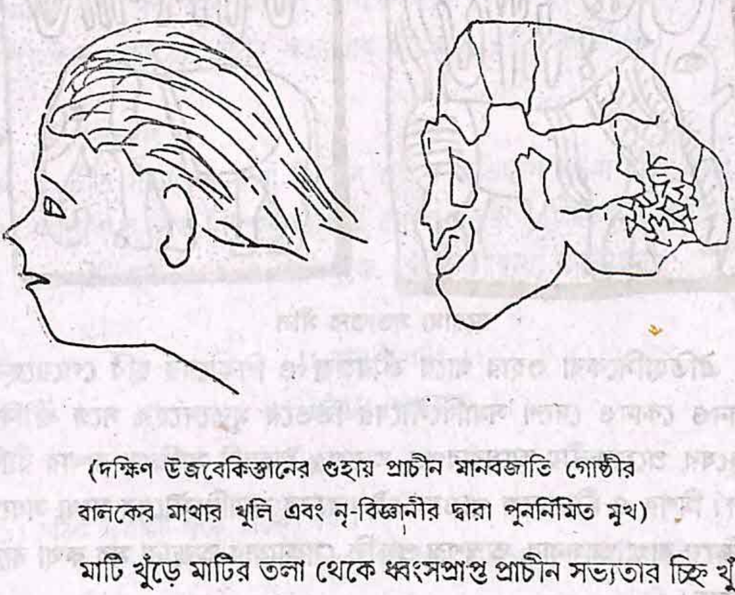
● প্রাচীন মানব সভ্যতার কথা কেমন করে জানা যায় :

প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। পৃথিবীর যেখানেই মানুষ গেছে, সেখানেই তার চিহ্ন ফেলে রেখে গেছে। প্রাচীন মানব সভ্যতার সেই সব চিহ্ন বা নিদর্শন খুঁজে বার করা বেশ কঠিন। সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে লক্ষ লক্ষ বছরের সঠিক ইতিহাস জানার কাজ আরও কঠিন। কারণ, প্রাচীনকালের মানুষের কীর্তি-চিহ্নগুলি লক্ষ লক্ষ বছরে ধুলো-বালির অনেক নিচে চাপা পড়েছে। তাছাড়া, এত লক্ষ

বছরে ভূ-পৃষ্ঠেরও নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফলে, প্রাচীন মানব সভ্যতার বহু নিদর্শন হারিয়ে গেছে।

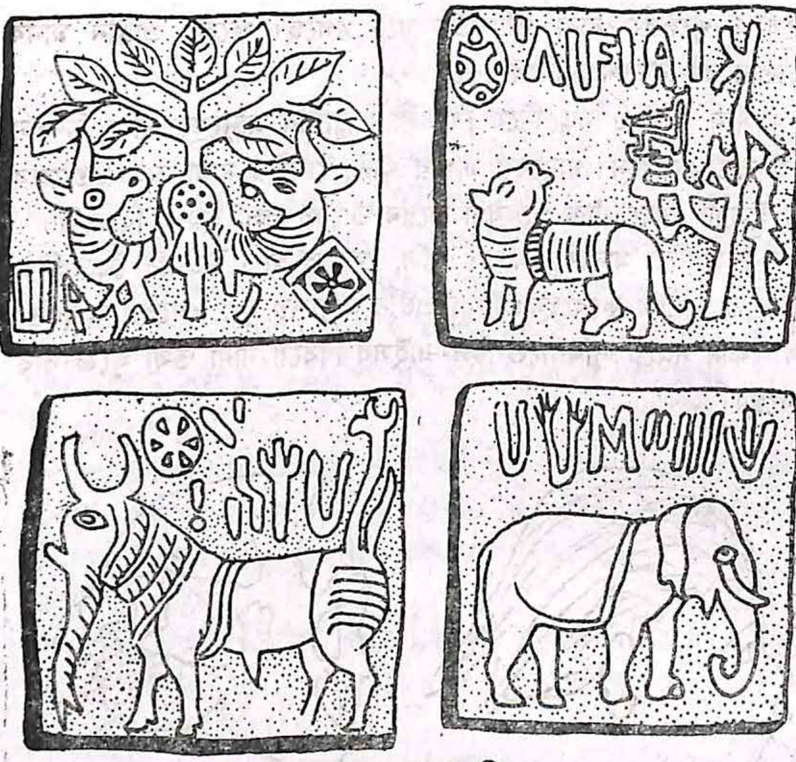
অসীম ধৈর্য ও যত্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মানুষের নানা নিদর্শন খুঁজে বার করেছেন। মানুষের মাথার খুলি, দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড় ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের বলা হয় নৃ-বিজ্ঞানী।

নৃ-বিজ্ঞানীরা মানুষের মাথার খুলি, দেহের হাড় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা প্রাচীন মানুষের মুখ, দেহের আকৃতি, তারা কোন সময়ে পৃথিবীতে ছিল--এইসব বিষয়ে নানা তথ্য খুঁজে বার করেছেন।



(দক্ষিণ উজবেকিস্তানের গুহায় প্রাচীন মানবজাতি গোষ্ঠীর বালকের মাথার খুলি এবং নৃ-বিজ্ঞানীর দ্বারা পুনর্নিমিত মুখ)

মাটি খুঁড়ে মাটির তলা থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে বের করেছেন যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের বলা হয় প্রত্নবিজ্ঞানী। সেকালের বাড়িঘর, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, নানা ধরনের হাতিয়ার, ছোটদের খেলনা, মাটির পাত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি পৃথিবীর নানা জায়গায় মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। গবেষণাগারে নানা পরীক্ষা করে প্রত্নবিজ্ঞানীরা বলতে পেরেছেন সেগুলি কত প্রাচীন। সেই সময়ের মানুষের জীবনযাত্রার ধরন জানাও সম্ভব হয়েছে।



হরোপ্পা সভ্যতার সীল

ঐতিহাসিকেরা গুহার গায়ে জীবজন্তু ও শিকারের ছবি পেয়েছেন। কোনও কোনও দেশে সমাধিসৌধের ভিতরে মৃতদেহের সঙ্গে জীবিত মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সাজিয়ে রাখার রীতি ছিল। মিশর ও চীনদেশে পাওয়া এই ধরনের সমাধিসৌধের মধ্যে সযত্নে সাজিয়ে রাখা আসবাব, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সেকালের অজানা সব কথা বলে উঠেছে।

প্রাচীন কালের মানুষ পাহাড়ের গুহায়, মন্দির বা পাথরের গায়ে রাজার আদেশ, যুদ্ধের কাহিনী বা ধর্মীয় বাণী, জলপথে নৌকায় বাণিজ্যের দৃশ্য প্রভৃতি খোদাই করে রেখেছে। এই সব খোদাই করা বা উৎকীর্ণ লিপি হাজার হাজার বছর আগের হারিয়ে যাওয়া মানুষের 'কথা বলে উঠেছে' ঐতিহাসিকদের কাছে। প্রাচীন কালের মুদ্রার গায়ে রাজার মূর্তি, পশু-পাখীর ছাপ. নাম, সময়কাল ইত্যাদি দেখে অনেক তথ্য জানা

যায়। বিশেষ ধরনের গাছের পাতা বা ছালের উপর লেখা পুঁথি থেকেও নানা বিষয় জানা যায়। তবে এই সব পুঁথির বেশিরভাগই রোদে জলে, কীটপতঙ্গের উৎপাতে নষ্ট হয়ে গেছে। পাথর বা মাটির টালির উপরেও সেকালের রাজারা তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ ও বীরত্বের কাহিনী লিখে রাখতেন। তামার পাতে খোদাই করা দানপত্রে নাম, বংশ পরিচয় লিখে রাখা হতো। পাথরের গায়ে অনেক সময়ে ধর্ম উপদেশও খোদাই করে লেখা হতো। তবে এই সব লিখিত ইতিহাস তিন-চার হাজার বছরের বেশি প্রাচীন নয়।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই অসংখ্য যাদুঘরে প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনার এই সব নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করা হয়। ইতিহাসবিদ্‌গণ এইগুলির সাহায্যে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন।

● কী শিখলে ●

- অতীত সভ্যতার নানা নিদর্শন থেকে ইতিহাস রচনা করা হয়।
- অনেক অতীত নিদর্শন হারিয়ে গেলেও যদিও নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ এ সব খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন।

।। অনুশীলনী ।।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

১) সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে লেখ ঃ

ক) মানব সভ্যতার আদি যুগে মানুষ ছিল — শুধু তৃণভোজী/বর্বর/অসহায়/ফলাহারী।

খ) সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষকে ক্রমাগত লড়াই করতে হতো — অন্যায়ের বিরুদ্ধে /প্রকৃতির শক্তিকে জয় করার জন্য/অত্যাচারের বিরুদ্ধে/ বনাঞ্চল রক্ষার জন্য।

গ) আমরা ইতিহাস পড়ব কেন — শুধু বর্তমানকে জানতে/শুধু অতীতের কথা জানতে/বর্তমানকে বোঝার জন্য অতীতকে জানতে/শুধু ভবিষ্যতের গল্প জানতে।

২) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ

ক) মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস রচনার কাজ খুবই কঠিন কেন?

খ) প্রত্নবিজ্ঞানী/নৃবিজ্ঞানী কাদের বলা হয়?

গ) কিভাবে এঁরা প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বার করেন?

ঘ) মানুষ কত দিন আগে লিখতে শিখেছে?

ঙ) ইতিহাসের নিদর্শন কোথায় রক্ষা করা হয়?

৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

ক) 'পাথর ইতিহাসের কথা বলেছে।' --কিভাবে?

৪) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?

খ) মানুষ কীভাবে প্রকৃতিকে জয় করল?

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

• আদিম যুগের মানব •

আদিম মানব কারা, কিভাবে পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার ধরনই বা কেমন ছিল—এসব বিষয়ে কিছুকাল আগেও আমাদের সঠিক ধারণা ছিল না। বহুকাল থেকেই ধর্ম মানুষকে বুঝিয়েছিল—মানুষ বিধাতার হাতে গড়া বা মানুষ স্বর্গের নানা দেব-দেবীর সন্তান। বিগত শতকে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে, এইসব ভুল বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল।

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবীতে নানা প্রাণীর জন্ম হয়েছে। প্রকৃতির এই ধীর পরিবর্তনের ধারাকে বলে বিবর্তন। প্রখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে* দেখালেন, কিভাবে বিবর্তনের নিয়মে



গুহা মানুষের করোটি



আদিম গুহা মানুষের করোটির পরিবর্তন

---

* চার্লস ডারইউনের বইটির নাম--অরিজিন অব স্পিসিজ্।



আদিম মানুষের মুখাবয়বের পরিবর্তন

পৃথিবীতে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে ও তাদের বংশবিস্তার ঘটেছে। এই বিবর্তনেরই এক পর্যায়ে আদিম মানব পৃথিবীতে আসে।

বিজ্ঞানীরা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার নানাস্থানে আদিম মানবের মাথার খুলি, কঙ্কাল ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছেন। সেইসব থেকে তাঁরা আদিম মানবের উদ্ভব এবং তাদের আকৃতি-প্রকৃতির হদিশ পেয়েছেন।

তাঁদের গবেষণার ফলে জানা গেছে, শিম্পাঞ্জী, গরিলা জাতীয় নরাকার প্রাণীর পরে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়। শিম্পাঞ্জী, গরিলা জাতীয় নরাকার প্রাণীর নাম* এপ্। প্রথমদিকে আদিম মানবের আকৃতি-প্রকৃতিতে 'এপ্'-এর লক্ষণই বেশি ছিল। আদিম মানবের বিভিন্ন বংশধর বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে এসেছিল। এদের দেহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা এদের প্রাচীনত্বের পরিচয় পেয়েছেন। এদের পৃথক নামকরণও* করেছেন।

আদিম মানুষ ছিল দলবদ্ধ বা যূথবদ্ধ। এক একটা দলে এদের সংখ্যা হতো প্রায় কয়েক ডজন। এরা প্রথম থেকেই প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো। হাঁটবার সময়ে তারা সামনের দিকে ঝুঁকে জবুথবু হয়ে হাঁটতো। এদের হাত এত লম্বা ছিল যে, হাঁটুর নিচে ঝুলে থাকতো।

* এপ-উচ্চ শ্রেণীর বানর। ভারতেও দিল্লীর উত্তরে শিবালিক পর্বতে এপ্ মানুষের জমে থাকা হাড় পাওয়া গেছে।

* আদিম মানবের আকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানীরা তাদের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করেছেন ও ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন, সিনানথ্রপাস (পিকিং মানব), পিথেকানথ্রপাস (জাভা মানব)। এরা একই যুগে বাস করতো; কিন্তু একই প্রজাতি নয়। তাছাড়া, ছিল নিয়ানডারথাল ও হাইডেলবার্গ (জার্মানী) এবং ক্রো ম্যাগনান মানুষ (ফ্রান্স)।



শিম্পাঞ্জী মানুষ

আমরা যেমন হাতের আঙ্গুল ইচ্ছামত নাড়াতে পারি তারা তা পারতো না। হাত দিয়ে তারা সহজ দু-চারটে কাজ করতে পারতো, যেমন—মাটি খোঁড়া, হাতের মুঠোয় কিছু ধরা কিংবা কিছু ছুঁড়ে ফেলা। মুখ দিয়ে শব্দ করে তারা ভয় ও ক্রোধ প্রকাশ করতো। আদিম মানুষের প্রথম বাসস্থান ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে পাহাড়ের গুহা।

আদিম মানুষের দেহে নানা পরিবর্তন আসে শ্রমের ফলে। শ্রমের ফলেই এদের মস্তিষ্ক পরিণত হয়। হাতের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। জীবন ধারণের জন্য উন্নত কৌশল আয়ত্ত করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এপ্ ও মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্যই হলো— মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতে পারতো, এপ্রা তা পারতো না।

উনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৮৯ খ্রীঃ) এশিয়ার যবদ্বীপে (জাভা) আদিম মানবের* হাড়, দাঁত ও জীবজন্তুর কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে। চীনের পিকিং (বর্তমান নাম বেজিং) নগরীর কাছে চৌকোতিয়েন শহর। এখানে চূনা পাহাড়ের এক গুহায় আদিম মানবের প্রথম খুলিটি খুঁজে পান (১৯২৯ খ্রীঃ) চীনা নৃ-বিজ্ঞানী পেই ওয়েন চুং। পরে এখানেই আরও মাথার খুলি, দাঁত, আগুনে পোড়া মাটি, পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি পাওয়া যায়। এরা 'পিকিং মানব' নামে



প্রস্তরযুগের মানুষ

* আফ্রিকার আদিম মানুষের নামকরণ হয়েছে হোমো ইরেক্টাস অর্থাৎ খাড়া মেরুদন্ডী মানুষ। বর্তমান বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, এরা ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে বেঁচে ছিল। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে খনন কাজ এখনও চলছে। হোমো সাপিয়েন্স বা প্রথম আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয় আঃ ৩০-৪০ হাজার বছর আগে।

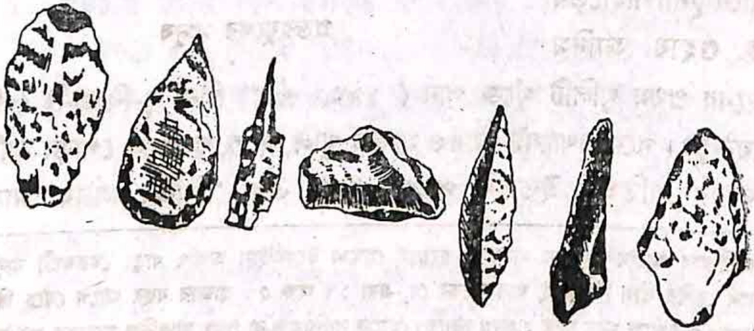
পরিচিত। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আরও আদিম মানুষের হাড় ও তাদের ব্যবহৃত প্রাচীন ধরনের পাথরের হাতিয়ার প্রত্নবিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন।

আদিম মানুষের এইসব নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা একটি সম্পূর্ণ মানব জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান পান। আগুনে ঝলসানো জীবজন্তুর হাড় এবং ছোটবড় পাথরের টুকরো থেকে আদিম মানবের জীবনযাত্রার ধরনও বোঝা যায়। আদিম মানব আগুনের ব্যবহার জানতো। তারা পাথরের টুকরোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। তারা দলবদ্ধভাবে গুহায় বাস করতো। জীবন ধারণের জন্য তাদের কঠোর শ্রম করতে হতো। আদিম মানবের আকৃতি-প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার ধরন থেকে একথা আজ নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, মানুষ নিজেই নিজেকে গড়েছে।

- **কী শিখলে**
- প্রাণী জগতে বিবর্তনের ফলে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে।
- আদিম মানব নরাকার এপ্-এর পরে পৃথিবীতে এসেছে।
- আদিম মানবজাতিগোষ্ঠীগুলির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার নানা স্থানে।
- আদিম মানব আগুনের ব্যবহার জানতো।
- শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে মানুষই নিজেকে গড়েছে।

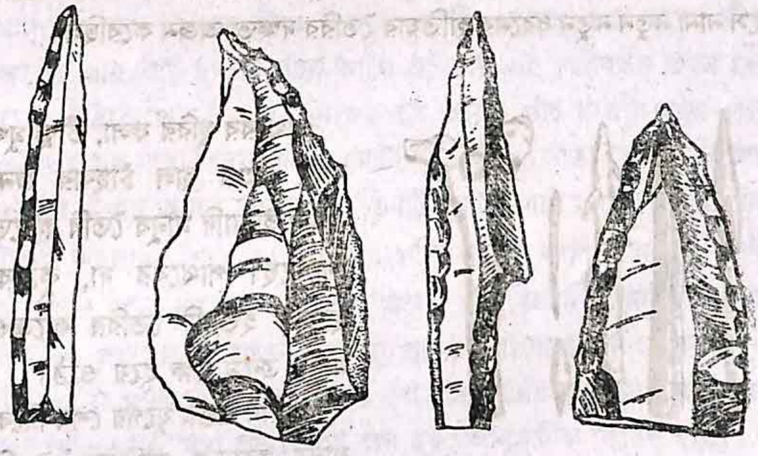
প্রাচীন প্রস্তর যুগ

আদিম মানুষের জীবনযাত্রার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আদিম মানুষের ব্যবহৃত নানা নিদর্শন



প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

পাওয়া গেছে। এইসব চিহ্ন থেকে আদিম মানুষের জীবনযাত্রার মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। আদিম মানুষের জীবন ছিল খুবই কষ্টের আর বিপদ ছিল প্রতি পদে পদে। হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারানো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ ছিল কম। কুড়ি বছর বয়স পার হবার আগেই অর্ধেকের বেশি মানুষ মারা যেত হয় হিংস্র পশুর আঘাতে, না হয় রোগে কিংবা অনাহারে। হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা আর খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষ হাতিয়ারের প্রয়োজন বোধ করে।

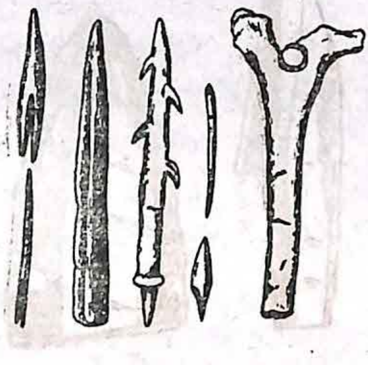


১। ছুরির ফলা, ২। ছুরির মোটা ফলা, ৩। বর্শার ফলা, ৪। পাতার আকৃতি ফলা

আদিম মানুষের তৈরি প্রথম হাতিয়ার ছিল হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা যায় এমন পাথর। এইরকম সুবিধাজনক পাথর তারা খুঁজে নিয়ে যত্ন করে রাখতো। এছাড়াও গাছের শক্ত সোজা ডাল বা লাঠিও তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতো। আদিম মানুষ ধারালো পাথর তৈরি করতে জানতো। পাথরে পাথরে ঠুকে তারা ধারালো অংশটিকে কাজে লাগাতো। এগুলির সাহায্যে তারা খাদ্য সংগ্রহ করতো। তারা হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াইও করতো। জীবনধারণের জন্য হাতিয়ার তৈরি করার মধ্য দিয়েই মানুষের শ্রমের শুরু।

মানুষের তৈরী পাথরের হাতিয়ারগুলি ছিল মোটামুটি তিন কোণা। মোটা দিকটা হাতের মুঠিতে ধরবার জন্য, আর সরু মুখটা দিয়ে কাজ করার জন্য।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ চলেছিল কয়েক লক্ষ বছর ধরে। এই যুগের শেষদিকে পৃথিবীতে এল তীব্র শীত। একে বলে তুষার যুগ। এখন থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে তুষার যুগ শুরু হয়। পৃথিবীর একাংশ ঢেকে গেল পুরু বরফে। পশু-পাখি, গাছপালা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা গেল, নয়তো একেবারে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলো। এই প্রচণ্ড শীতেও মানুষ টিকে থাকতে পেরেছিল। শুধু তাই-ই নয়, এই সময়ের মধ্যে সে নানা নতুন নতুন ধরনের হাতিয়ার তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছিল।



প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

পাথরের ছুরির ফলা, তীক্ষ্ণ মুখ বর্শা, পশুর ছাল চাঁছবার জন্য র‍্যাঁদা ইত্যাদি মানুষ তৈরি করতে শিখেছে। পাথরের দা, কুঠার, হাতুড়ি ইত্যাদি তৈরির কাজেও মানুষ ক্রমে দক্ষ হয়ে ওঠে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ হাড়ের হাতিয়ার তৈরি করতে শেখে। কাঠের তীর ধনুকও তৈরি করতে শেখে। দূর থেকে তীর ও বর্শা ছুড়ে শিকার করা যথেষ্ট নিরাপদ ছিল। কাজের সুবিধার জন্য মানুষ কোনো কোনো হাতিয়ারের ধরার দিকে ফুটো করে হাতল লাগাতেও শেখে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। তখনও মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক। খৃষ্টপূর্ব প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে থেকে আনুমানিক তিরিশ হাজার খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির এই প্রাচীন ধারা চলেছিল।

● কী শিখলে ●

● আদিম মানুষের জীবন ছিল অসহায়। হাতিয়ার হিসাবে পাথর, গাছের ডাল ও লাঠি ব্যবহার করত।

● মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক।

● নব্য প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পরে অনেক কাল কেটে গেছে। পৃথিবী থেকে তুষার যুগের অবসান ঘটতে থাকে। এখন থেকে প্রায় আঠারো হাজার বছর আগে পৃথিবী আবার তার উষ্ণতা ফিরে পেতে থাকে। বরফ ধীরে ধীরে গলতে থাকে এবং ক্রমশ উত্তরে সরে যায়। ভূ-পৃষ্ঠ বরফমুক্ত হওয়ায় পৃথিবীতে আবার গাছপালা, বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়। যে সব জীবজন্তু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা উত্তরে চলে যায়। পশুশিকারী কিছু মানুষের দল পশুদের পিছন পিছন যায়। কিছু মানুষের দল এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে বসতি গড়তে শুরু করে। যীশুর জন্মের প্রায় আট হাজার বছর আগে এশিয়ায় এই পরিবর্তন প্রথম দেখা দেয়। ইউরোপে এই পরিবর্তন শুরু হয় আরও পাঁচ হাজার বছর পরে। এই সময়ের মধ্যে মানুষ গাছের মোটা গুঁড়ি কুঁদে ডোঙা তৈরি করে জলে ভাসার উপায় আয়ত্ত করেছে। দু'তিনটি মোটা কাঠের গুঁড়ি বেঁধে ভেলা তৈরি করতেও শিখেছে। ভূপৃষ্টের পরিবর্তনের ফলে মানুষের দলবদ্ধ জীবনেও বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রত্ন বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতার এই নব পর্যায়ের পরিবর্তনকে 'নব্য প্রস্তর যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

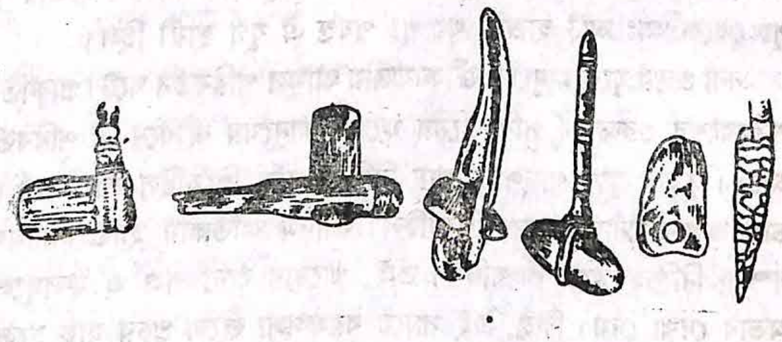
প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান ও নব্য প্রস্তরযুগের সূচনাকালের মধ্যবর্তী মানবসভ্যতাকে 'মধ্য প্রস্তর যুগ' বলা হয়। আনুমানিক তিরিশ হাজার খৃঃ পূঃ থেকে আঃ আট হাজার খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ঐ যুগ স্থায়ী ছিল।

নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলেই মানুষের জীবনে ঐ পরিবর্তন আসে। তুষার যুগে গাছপালা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আর বেশির-ভাগ জন্তু-জানোয়ার মারা গিয়েছিল। আদিম অতিকায় হাতি (ম্যামথ) সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই, খাদ্যের জন্য পশু ও ফলমুলের অভাব দেখা দেয়। কিন্তু, এই সময়ে বরফগলা জলে প্রচুর মাছ হলো। মাছ শিকারের জন্য মানুষ দল বেঁধে জলা জায়গার কাছাকাছি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। পুরুষরা মাছ শিকার করতে শেখে,আর দলের

মেয়েরা মাটি খুঁড়ে গাছের মূল সংগ্রহ করতে শেখে। সেই মূল মাটিতে পুঁতে ফসল উৎপাদনের দক্ষতা আয়ত্ত করে। ফসলের মধ্যে গম ও যবের চাষ সবচেয়ে প্রাচীন। পশ্চিম এশিয়ার ইরাক, ইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বপ্রথম এসবের ফলন শুরু হয়।

মানুষ ফসল বুনতে, মাছ শিকার করতে শিখলো। এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ঘর তৈরি করতে শিখলো। শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে পশুর লোম বা গাছের ছালের আঁশ দিয়ে কাপড় বুনতেও শিখলো। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক। এবার মানুষ হয়ে উঠল খাদ্য-উৎপাদক। প্রকৃতির উপর তাদের আর ততটা নির্ভর করতে হয় না। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের দল বিভিন্ন ধরনের শ্রমের দক্ষতা আয়ত্ত করলো। অর্থাৎ মানুষের সমাজে দেখা দিল শ্রম বিভাগ। নানা ধরনের শ্রমের উপযোগী হাতিয়ারও মানুষ তৈরি করলো। উন্নত ধরনের পাথরের কুড়ুল, কাঠ কাটার পাথরের করাত ছাড়াও কপিকল, কাস্তে, নিড়ানি, শষ্য পেষাই করার উদূখল, মাছ ধরার বঁড়শী, বাটালী, সুঁচ—এইসব হাতিয়ার মানুষ হাড় ও পাথর ঘষে তৈরি করতে শেখে। নব্য প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাথরের সুঁচ, বোনার কাঁটা, তাঁত কাঠি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে এইসব কাজ মেয়েরাই করতো। তাই, সমাজে তখন মেয়েদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

ফসল বুনতে শেখার ফলে মানুষ পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে

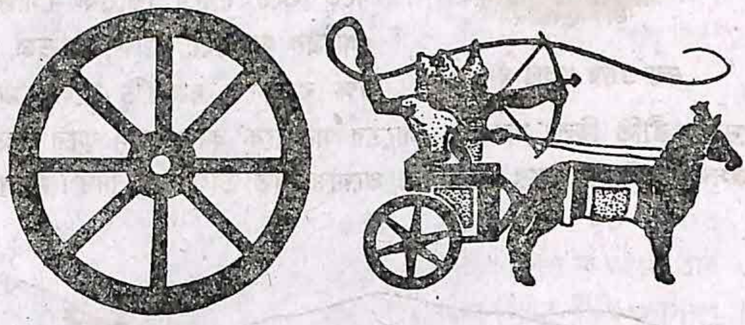


নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

লাগাতে শেখে। তবে পশুশিকারী মানুষই সর্বপ্রথম কুকুরকে পোষ

মানাতে শুরু করে। প্রাচীন মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু কুকুর। যীশুর জন্মের প্রায় আট হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিজ্ঞানীরা কুকুরের হাড় খুঁজে পেয়েছেন। আরও দু'হাজার বছর পরে ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, গাধা, বলদ প্রভৃতি পশুকে মানুষ পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে শেখে। সর্বশেষ গৃহপালিত পশু ঘোড়া।

ফসল বোনা ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হস্তশিল্প বা কারিগরি শিল্পেও দক্ষ হয়ে ওঠে। হস্তশিল্পের কাজে দক্ষ মানুষ মাটির হাঁড়ি, থালা-



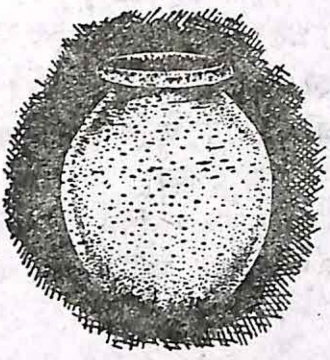
চাকা

বাটি ইত্যাদি তৈরি করতে শেখে। গাছের ছাল ও ডাল দিয়ে তারা ঝুড়ি বুনতে শেখে। নব্য প্রস্তর যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার— চাকা। মাটির পাত্র তৈরির জন্যই প্রথমে মৃৎশিল্পীরা* কুমোরের চাকা তৈরি করে।

ফসল বুনে তা রক্ষা করা দরকার। তাই, জমির কাছাকাছি নানা ধরনের ঘরবাড়ি মানুষ তৈরি করতে শেখে। কখনও তারা মাটি খুঁড়ে গর্ত করতো। সেই গর্তের চারপাশে হাড় ও লতাপাতা, ঘাস জাতীয় আগাছা, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে ঘর তৈরি করতো। পাথর দিয়েও বাড়ি তৈরি হতো। আবার, জলাভূমির ধারে বা হ্রদের মধ্যে খুঁটি পুঁতে তার উপর বাড়ি তৈরি করাও হতো।

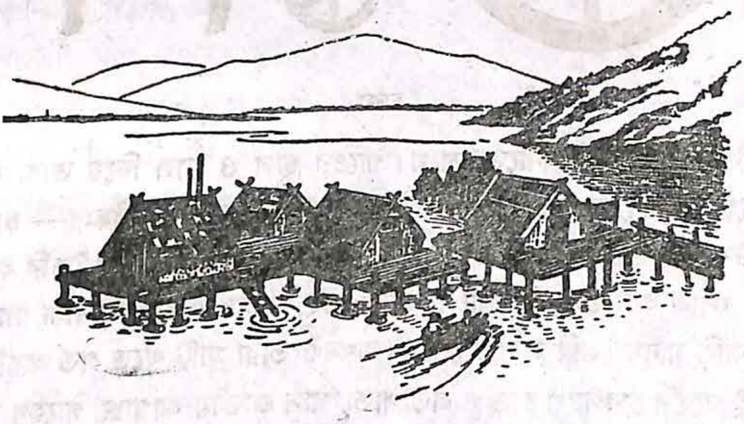
উন্নত ধরনের শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাচীন দলবদ্ধ সমাজেও রূপান্তর ঘটে। জমিতে ফসল ফলানো, পশুপালন, পোষাক তৈরি, বাড়িঘর

*মৃৎশিল্পী - মাটি দিয়ে যারা নানা জিনিস তৈরি করে।



নব্য প্রস্তর যুগের মৃৎপাত্র

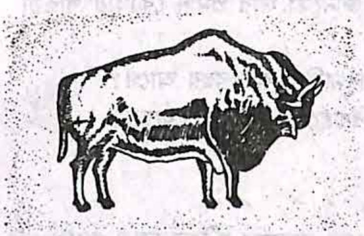
তৈরি, এইসব কাজই মানুষ দলবদ্ধভাবে করতো। দলের সকলে মিলে যে সম্পদ তৈরি করতো তা দলের সকলেই ভোগ করতো। হাতিয়ারগুলি ছিল দলের সম্পত্তি। সম্মিলিত শ্রম ও যৌথ সম্পদ দলের মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে। গড়ে ওঠে গোত্র ভিত্তিক গোষ্ঠী। গোত্রের সবচেয়ে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিকে দলপতি বলে মেনে নেবার রীতি ছিল। দলপতি গোত্রের সকলকে কাজ ভাগ করে দিত। ফসল বা শিকার করে আনা পশু প্রয়োজনমত ভাগ করে দিত। যূথবদ্ধ



হ্রদের উপর তৈরী বাড়ি

মানুষ অপেক্ষা গোত্র ছিল অনেক সংগঠিত। একই জায়গায় বসতি গড়তো যেসব গোত্র তাদের নিয়ে গঠিত হতো কৌম। কৌমের আচার-অনুষ্ঠান একই রকম হতো। কৌমভুক্ত গোত্রগুলির দলপতিদের মিলিত সভা ছিল গোত্র পঞ্চায়েত। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে জমি, ফসল বা পশু নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে এই গোত্র পঞ্চায়েত বিচার করে মিটিয়ে দিত।

আদিম মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ বুঝতো না। তাই তারা এইসব ঘটনাকে খুব ভয় পেতো। তারা বিশ্বাস করতো, কোন অলৌকিক শক্তি এইসব ঘটনা ঘটায়। মানুষের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কেও কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা তাদের ছিল না। জীব-জন্তু, মানুষ, পশু-পাখি সকলেরই আত্মা আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো। নানা অপদেবতা, ভূত, প্রেত, ডাইনি ইত্যাদিকে তারা রোগ বা মৃত্যুর কারণ বলে বিশ্বাস করতো। প্রাচীন মানুষের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় তাদের শিল্পে ধরা পড়ে। শিকারে বেরোবার আগে প্রাচীন মানুষ প্রথমে পশুর ছবি এঁকে আগে তাকে বধ করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল এই পদ্ধতিতে 'যাদুবলে' তারা ভাল শিকার পাবে।


বাইসন
আলতামিরা গুহা (স্পেন)

অপদেবতা বা ভূত তাড়াবার নানারকম যাদুমন্ত্রেও তারা বিশ্বাস করতো। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে ঘরে ফিরে না আসে তার জন্য তারা নানা বিচিত্র রীতি অনুসরণ করতো এবং মৃতদেহকে মাটির নিচে কবর দিত। আবার, মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে কষ্ট না পায়, সেজন্য কবরের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস সাজিয়ে দিত।

প্রাচীন মানুষের সমাজে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। পৃথিবীর নানা দেশে মাটির তৈরি পাথর ও হাড়ের উপরে খোদাই করা নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। মাটি থেকে শস্য জন্মায় বলে মাটিকে নারীরূপে পূজা করার নানা পদ্ধতি প্রাচীন মানুষ মেনে চলতো।

● কী শিখলে ●

- আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও জীবজন্তুর নানাস্থানে গমনাগমন শুরু হয়।
- মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন— খাদ্য-উৎপাদক মানুষ, স্থায়ী

বাসস্থান, ফসল উৎপাদন (গম ও যব), শ্রম বিভাগ, কাপড় বোনা, উন্নত হাতিয়ার তৈরী, মেয়েদের মর্যাদা, পশুকে পোষ মানানো, চাকা তৈরী, গোত্র ও কৌম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও প্রকৃতি পূজা।

।। অনুশীলনী ।।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

১) দু'এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক) কত বছর আগে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়?

খ) পৃথিবীতে প্রথম প্রাণী কী?

গ) আদিম মানুষের বাসস্থানের চিহ্ন পাওয়া গেছে এমন দুটি দেশের নাম বল।

ঘ) মানব সভ্যতার প্রাচীনতম 'যুগ'কে কী বলা হয়?

ঙ) আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার জানতো তার প্রমাণ কোথায় পাওয়া গেছে?

চ) নব্য প্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল আনুমানিক কত বছর আগে?

ছ) কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানী মানুষের বিবর্তনের নিয়ম লিখেছেন?

জ) আলতামিরা গুহা কোথায়?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ

ক) নব্যপ্রস্তরযুগ এবং পুরা প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

খ) 'পিকিং মানবের' জীবন কেমন ছিল?

গ) পৃথিবীর আদিমতম 'যান' কিভাবে তৈরি করা হতো?

ঘ) মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি কিভাবে হয়?

ঙ) মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করতো কেন?

৩) আদিম মানুষ ব্যবহার করতো এমন কয়েকটি জিনিস নিচে উল্লেখ করা হলো। কোনগুলি পুরা প্রস্তর যুগের এবং কোনগুলি নব্য প্রস্তর যুগের সাজিয়ে দাও ঃ-

ভোঁতা পাথরের টুকরো, পোড়া হাড়, পাথরের ধারালো কোদাল, কুড়ুল, বর্শা, পশুর ছাল, গাছের ছাল, কুমোরের চাকা, পশুর লোমের কাপড়।

৪) সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ—

ক) আদিম মানুষকে পশুপালক বলা হতো।

খ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ দল বাঁধতে শেখেনি।

গ) ঐ যুগের মানুষের অন্যতম আবিষ্কার হলো চাকা।

ঘ) ঐ যুগে গরুই ছিল আদিমতম যান।

ঙ) সে যুগে মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে ইশারায় কথা বলত।

৫) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ--

ক) আদিম মানুষ কীভাবে জীবন কাটাত?

খ) প্রাচীন প্রস্তরযুগের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

গ) প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ কীভাবে পাথরকে কাজে লাগাত?

ঘ) নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষ যে সব পরিবর্তন আনে তার তিনটি দিকের উল্লেখ করে লেখ?

ঙ) ঐ যুগে চাষবাস কীভাবে চলত?

চ) ফসল কীভাবে রক্ষা করা হোত?

ছ) কীভাবে গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে?

জ) বৌমের জীবনযাপন রীতি কেমন ছিল?

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

● তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ ●

প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। নব্য প্রস্তর যুগের পর বহু বছর কেটে গেল। মানুষের জীবনধারায়ও অনেক পরিবর্তন এলো। এই পরিবর্তনের যুগেই মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। তবে অনেকেই অনুমান করেন যে, নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগ থেকেই মানুষ ধাতুর ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। পাথরের বদলে তারা তামার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লাগল। তামা সহজে পাওয়া যেতো, গলানোও যেত সহজে। তামার হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি অনেক সূক্ষ্ম ও ধারালো হতো। সম্ভবত সুমেরের মানুষই প্রথম তামা ব্যবহার করতে শেখে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে। পরে মানুষ তামার চেয়ে আরও শক্ত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তামা ও টিন মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করল। তাই এই সময়কালকে 'তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ' বলা হয়। এই যুগ শেষ হয় আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। এই যুগে মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

নগরের উদ্ভব

মানুষ প্রথমে চাষবাস শিখে গ্রামে একসঙ্গে বাস করত। তার পাশাপাশি পশুপালনও ছিল তাদের জীবিকা। কিন্তু ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বাড়তে লাগলো। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা অন্য জায়গায় আরও উর্বর জমি খুঁজে বেড়াতে লাগল। নদীর ধারের জমি চাষের পক্ষে বেশি উপযোগী। তাই তারা প্রধানত নদীর ধারেই বাস করতে চাইল। এই ভাবে জনপদ গড়ে উঠল। এই জনপদগুলোই পরের দিকে নগরে পরিণত হল। এই সময়ের নগরের ধ্বংসাবশেষ মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত, চীন, পারস্য ও ক্রীটে আবিস্কৃত হয়েছে। প্রাচীন নগর এ সব দেশেই সম্ভবত প্রথম গড়ে উঠে।

এই সব নগরের মানুষেরা দেখল যে, কৃষির উন্নতির ফলে খাদ্যের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। ফলে তারা অবসর সময়ে বিভিন্ন কাজে

লেগে গেল। অনেকে আবার কৃষি ও পশুপালন ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শুরু করল। কেউ ছুতোরের কাজ, কেউ কুমোরের কাজ, আবার কেউ কামারের কাজে নেমে পড়ল। কেউ বা রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করল। এইভাবে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মানুষের দক্ষতা বাড়লো। সমাজে মানুষ বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হল। শ্রমবিভাগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হল। এতে শ্রমবিভাগ আরও ব্যাপক রূপ নেয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন

চাষী, কুমোর, কামার, তাঁতি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রিরা তাদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কিছু জিনিস উৎপন্ন করত। ঐসব জিনিসের জিনিসের বদলে তারা চাহিদা অনুযায়ী জিনিস নিতে লাগল। শুধু একই পল্লী বা নগরের মধ্যেই যে প্রয়োজনীয় জিনিসের দেওয়া-নেওয়া চলত তাই নয়, পাশাপাশি অঞ্চলের মধ্যেও তা চালু হল। এইভাবেই বিনিময় ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হল। আরও উৎপাদন বাড়ানোর তারা চেষ্টা করতে লাগলো। বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। তারা এক জায়গা থেকে পণ্য সংগ্রহ করে অন্য জায়গায় তা বিক্রির ব্যবস্থা করত। গরুর গাড়ি বা নৌকো করে তারা পণ্য বহন করত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাজার গড়ে উঠল।

ব্যবসা বাণিজ্য

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনেও এল এক বিরাট পরিবর্তন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে ধনী হতে লাগল। সমাজে বৃত্তি ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। একদল বেশি উৎপাদন করে বা ব্যবসা করে ধনী হল, আর একদল গরিবই থেকে গেল। এই দুই শ্রেণীর মাঝে যারা ছোট ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, পূজা পার্বনে নিযুক্ত তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হোত। সমাজে সম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের লোভে বাইরের শত্রুদের আক্রমণ শুরু হল। যুদ্ধে যারা হেরেছে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হল। এই ক্রীতদাসদের উৎপাদনের কাজে লাগানো হল। এভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সৃষ্টি হল।

সামাজিক পরিবর্তন

প্রথম দিকে গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল।

শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়েও জাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ক্রমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। একে অন্যের সম্পদ লুট করার চেষ্টা করত। তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। এছাড়া, নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে ঝগড়াও হত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পত্তি ও জমি দখলের জন্য সংঘর্ষ হত। তাই বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্পদ রক্ষার জন্যে তারা এক বা একাধিক যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব তুলে দিত। এই নেতা বা নেতাদের দায়িত্ব ছিল শান্তি রক্ষা ও উপজাতি আক্রমণের হাত থেকে নিজের দলকে রক্ষা করা। এই দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরাই ক্রমে সমাজের শাসক হয়ে উঠলো। শাসন ও আইন তৈরি হল। এই ভাবেই রাজা বা পুরোহিতরা শাসক হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র গড়ে উঠল। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও বিরোধ দেখা দিল।

জাতিগোষ্ঠী বিরোধ

রাষ্ট্রের বিরোধ

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি যে, পৃথিবীর প্রথম সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। নীলনদের তীরে মিশরের সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নদী উপত্যকায় এই সভ্যতাগুলো কোন আকস্মিক কারণে গড়ে উঠেনি। নদী উপত্যকার পলিমাটিতে ফসলের উৎপাদন বেশী হয়, জলসেচেরও সুবিধা থাকে। তাছাড়া, নদীপথে মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। নদীর মাছ যেমন অধিবাসীরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তেমনি নদী পাড়ে পলি মাটিতে প্রচুর গাছ-পালা হয় এবং তৃণভূমি পশুপালনের উপযোগী হয়। জীবন ও জীবিকার সহজ উপায় এখানে থাকায় লোক বেশি সংখ্যায় বসবাস করতে থাকে। এই সব কারণে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ



পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা

- **কী শিখলে**
- তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে নানা জায়গায় নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠেছে।
- নগর, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা বিরোধ, নানা উন্নতি ও নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

।। অনুশীলনী ।।

তৃতীয় অধ্যায়

১) দু'এক কথায় লেখ :

ক) কোন্ দেশের মানুষ প্রথম তামার ব্যবহার শেখে?
খ) কোন্ কোন্ ধাতু মিশিয়ে 'ব্রোঞ্জ' আবিষ্কার হয়?
গ) 'চাষবাস' ছাড়াও মানুষের আর একটি প্রধান জীবিকা কী ছিল?
ঘ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা পৃথিবীতে কত বছর আগে শুরু হয়েছিল?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

ক) কী কী উপায়ে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে যায়?
খ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে ভিন্ন ভিন্ন পেশার সুযোগ কিভাবে শুরু হয়?
গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব কিভাবে হয়?
ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থা কিভাবে সমাজে পরিবর্তন এনেছিল?
ঙ) মানুষ কিভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হলো?
চ) রাষ্ট্রের উদ্ভব কিভাবে হয়?

৩) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

ক) কী কী সুবিধার জন্য প্রাচীনকালে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে?
খ) 'তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ' বলতে কী বোঝায়?

৪) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক) ব্রোঞ্জ যুগে গড়ে উঠেছিল — ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতা/গুহামানুষের সংস্কৃতি।
খ) বিনিময় প্রথা হলো — মানুষের বদলে জিনিস কেনাবেচা/দেশকে জয় করে জিনিসপত্রের কেনাবেচা/জিনিসের বদলে জিনিসের কেনাবেচা।
গ) তাম্র যুগের অন্যতম সামাজিক পরিবর্তন হলো — শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সৃষ্টি/পুরোহিতদের শক্তি হ্রাস/জঙ্গল কেটে নগরের সৃষ্টি/ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেওয়া।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

• মেসোপটেমিয়া সভ্যতা •



কীলক লিপি
পৃঃ ২৮ (সুমের)

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

পারস্য উপসাগরের উত্তরে বর্তমানে যে দেশটির নাম ইরাক, তাকেই প্রাচীনকালে বলা হত মেসোপটেমিয়া। 'মেসোপটেমিয়া'র অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। এই নাম গ্রীকদের দেওয়া। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সমভূমির প্রাচীন নাম মেসোপটেমিয়া। এই দুই নদীর জল ও পলিমাটিতে এই অঞ্চলটি ছিল খুব উর্ব্বর। সম্ভবত প্রায় ছ'হাজার বছর আগে এই অঞ্চলেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল। এখানে ছোট ছোট পাহাড়ের মত উঁচু ঢিপি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে 'টেল' বলে। এই টেল খুঁড়ে মাটির বিভিন্ন স্তরে বসতির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই ধ্বংসাবশেষ থেকেই জানা যায় যে, এই সভ্যতা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের। এই অঞ্চলে অনেক স্বাধীন স্বতন্ত্র নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়ার নিচের অংশের নাম সুমের। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ছিল সুমেরিয়াকেন্দ্রিক। সুমেরিয়ার অধিবাসীদের 'সুমার' বলা হত। সুমার শব্দের অর্থ 'কালো চুলের মানুষ'। সুমাররা ছিল খুব পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান। কয়েকশো বছরের মধ্যেই এরা এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

ভূমির উর্ব্বরতা ও ফসল

মানুষ যখন এই অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করল তখন অধিকাংশ অঞ্চল ছিল জলাভূমি আর জঙ্গলে ভরা। জলাভূমিতে মাছ ও পাখি আর বালিয়াড়িতে খেজুর পাওয়া যেত। গৃহপালিত পশুর খাদ্যের অভাবও ছিল না। নদীর বন্যায় পলিমাটিতে এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত উর্ব্বর। এখানকার



হায়রোগ্লিফ লিপি (মিশর)

উষ্ণতাও কৃষির উপযোগী ছিল। ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল যব ও গম। তারা সবজি ও শনের চাষও করত। খেজুরের চাষ হত প্রচুর। খেজুর গাছকে তারা 'জীবনবৃক্ষ' বলত। দৈনন্দিন জীবনে এই গাছ অনেক কাজে লাগতো।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

নদী যেমন ছিল তাদের কাছে আশীর্বাদ, তেমনি ছিল অভিশাপও। নদীতে প্রায়ই বন্যা হত। বন্যায় ভেসে যেত ঘরবাড়ি, চাষের জমি, গৃহপালিত জীবজন্তু। তাই তারা বুঝেছিল যে, এই নদীকে বাঁধতে না পারলে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তারা একাজে সফল হয়েছিল। তারা জায়গায় জায়গায় মাটির উচুঁ বাঁধ দিয়ে বন্যার জল ঠেকাতো। আর চওড়া চওড়া খাল কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করত। তাছাড়া, বাঁধ দিয়ে বন্যার জল ধরে রেখে সেচের



হায়রোগ্লিফ লিপি চিত্র পৃঃ ৩০

কাজে লাগাত।

শুধু কৃষি ও পশুপালনই তাদের জীবিকা ছিল না। তাদের মধ্যে বহু লোক নানান পেশায় নিযুক্ত ছিল। কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, তাঁতি, স্যাকরা প্রভৃতি নানা পেশার লোক ছিল। তাছাড়া ছিল শিক্ষক, পুরোহিত ও সৈনিক। মজুরের কাজ করত অনেকে। কিছু লোক ব্যবসা বাণিজ্য করত। ব্যবসা বাণিজ্যের হিসেব নিকেশ রাখার জন্য কেরাণীর কাজও কেউ কেউ করত। দেশে পুরোহিতরাই ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শ্রেণী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতরাই ছিল দেশের শাসক। এই যুগে বয়ন ও ধাতুশিল্পের খুব উন্নতি হয়েছিল।

পেশা

সুমাররা সুমের অঞ্চলে অনেক নগর ও জনপদ গড়ে তুলেছিল। নগর ও জনপদগুলো ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সুমেরের উত্তরে আক্কাদ নগরকে কেন্দ্র করে আর একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এখানকার লোকেরা ছিল অন্য জাতির লোক। পরবর্তীকালে সুমের ও আক্কাদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে।

নগরগুলো ছিল উঁচু পাঁচিল আর চওড়া খালের ঘেরা সুরক্ষিত। নগরের রাস্তাগুলো ছিল সরু। রোদে পোড়া ইট দিয়ে তারা ঘর বাড়ি তৈরি করত। পরবর্তীকালে কাঠ ও পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেক দোতলা বাড়িও ছিল। সুমেরীয় সভ্যতায় ধর্ম, দেবতা, দেবমন্দির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বড় বড় মিনার তৈরি করে তার উপর মন্দির গড়ত। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ভূমি দেবতা 'এনলিশ' ও জলদেবতা 'এনকি'। মন্দিরের দেয়ালে নানা রঙের ঝিনুক ও পাথর দিয়ে ছবি আঁকা হত। অনেক সময় ধাতু বা হাতির দাঁতের ওপর কারুকার্য করে দেয়ালে আটকানো হত। পাথর কেটেও খোদাই করে তারা দেবতা, জীবজন্তু, মানুষের মূর্তি গড়ত। পাথর কেটে তারা বাসনপত্র তৈরি করত। দামী পাথর ঘসে পালিশ করে তারা গয়না তৈরি করত। তাতে নক্সা কাটা হত, দামী পাথরও বসানো হত। সোনা ও রুপো দিয়ে তারা গয়না তৈরি করত। ইটের দেয়ালে তারা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত।

স্থাপত্য ও শিল্প

ধাতুশিল্পেও তারা ছিল অতি দক্ষ। যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হত। তারা তামা ও ব্রোঞ্জ গলিয়ে ছাঁচে ফেলে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করত। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করত।

ধাতুশিল্প

কুমোরের চাকা দেখে তারা প্রথম চাকা দেওয়া গাড়ি ব্যবহার করতে শিখলো। পশুরাই এই গাড়ি টানতো। জলপথে পরিবহনের জন্য তারা নৌকা ব্যবহার করত। পালতোলা নৌকা করে তারা সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারা পশমের কাপড়, গম, যব, ফল সিন্ধু অঞ্চলে পাঠাতো এবং সেখান থেকে আসতো নিজেদের দরকারি জিনিসপত্র। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই দক্ষ ছিল। রুপোর টাকা ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।

পরিবহন ও বাণিজ্য

সুমেরের লোকেরা নরম মাটির টালিতে নলখাগড়ার কলম দিয়ে নানান কথা লিখে রাখতো। পরে এই টালিকে আগুনে পুড়িয়ে নিত। লেখাগুলো তীরের ফলার মত দেখতে ছিল বলে এই লিপিকে **'কীলকাকৃতি লিপি'** বলা হয়ে থাকে। এই লিপির সাহায্যে তারা চিঠিপত্র লিখতো, হিসাব রাখত, এমনকি বইও লিখত। সুমেরীয় সভ্যতার **শ্রেষ্ঠ নিদর্শন** তাদের এই লিপি। এই লিপি দিয়ে সুমাররা নানা বিষয় সম্বন্ধে লিখে গেছেন। যেমন, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণনা পদ্ধতি, ঋতু পরিবর্তন, কাল নির্ণয়, ইত্যাদি।

লিপি

● কী শিখলে ●

- এ সভ্যতা ছিল তাম্র, ব্রোঞ্জ যুগের।
- সুমেরীয়রা মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতা গড়ে তুলল।
- তারা বহু শ্রম ও চেষ্টায় নদীকে কাজে লাগাল।
- সমাজে নানা শ্রেণীর লোক ছিল।
- স্থাপত্য শিল্প, ধাতু ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা খুব দক্ষ ছিল।
- তাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—কীলকাকৃতি লিপি, গণনা পদ্ধতি, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি।
- বাইরের দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

• মিশরীয় সভ্যতা •

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে মিশর অবস্থিত। মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে লোহিত সাগর। পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি ও পূর্বে আরবের মরুভূমি। মিশরের মধ্য দিয়ে নীলনদ উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে। মরুভূমির জন্য মিশরের জলবায়ু খুব উষ্ণ ও শুষ্ক। বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমির দেশে পরিণত হত। প্রত্যেক বছর নীলনদের বন্যায় দু'পাশের জমি পলিমাটি পড়ে উর্বর হত। এই ধরনের জমি কৃষির পক্ষে খুবই উপযোগী। এই নীলনদের তীরেই প্রাচীনকালে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল । নীল নদের জন্যই মিশরে সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছিল। সেই জন্য মিশরের সভ্যতাকে 'নীলনদের দান'* বলা হয়। এই সভ্যতা আনুমানিক চারহাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল।

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি

সুপ্রাচীন যুগে চল্লিশটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে জন্ম নেয় মিশর রাষ্ট্র। মিশরের রাজাদের 'ফ্যারাও' বলা হত। মিশরীয় ভাষায় প্রাসাদকে 'পেরো' বলা হতো । যিনি প্রাসাদে বাস করেন তিনি ফ্যারাও। সম্ভবত এই অর্থেই সম্রাটকে 'ফ্যারাও' বলা হত। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, ফ্যারাও নিজে দেবতা। তাঁরই আদেশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে, ঋতু পরিবর্তন হয়, বৃষ্টি ও বন্যা হয়।

ফ্যারাও ও পুরোহিত

রাজা যে দেবতা এই বিশ্বাস পুরোহিতরা মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল। তারা বলত— মিশরের কল্যাণ সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। ফ্যারাওরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন একাধারে শাসক, বিচারক



সোনার মুখোশ
ফ্যারাও টুটেনখামেনের

---

*গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ঐ উক্তি করেছিলেন।

ও সেনাবাহিনীর প্রধান। এই ফ্যারাওদের মধ্যে মেনেস, খুফু, টুটেনখামেন, দ্বিতীয় রামেসিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরোহিতদের নিয়োগকর্তা ছিলেন ফ্যারাও। মন্দিরগুলির অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। তা দখল করেই পুরোহিতরা প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করত। মন্দিরের কাজকর্মের জন্য অনেক দাসদাসীও ছিল। ফ্যারাওরা পুরোহিতদের হাতে এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কারণ, প্রজারা যাতে বিদ্রোহী না হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্য পুরোহিতরা তাদের বোঝাতেন যে, দুঃখ-কষ্টের জীবনকে মুখ বুজে মেনে নিলে, পরলোকে তারা অনেক শান্তি পাবে। তাই ফ্যারাও রাজ্য শাসনের ক্ষমতা অনেকটাই পুরোহিতদের হাতে তুলে দিতেন। তবে পুরোহিতরা মন্দিরে বিদ্যাকেন্দ্র করে শিক্ষাদানও করতেন। এঁরা বর্ষপঞ্জীও তৈরি করতেন।

প্রাচীন মিশরে তিনটি রাজবংশ প্রায় তিন হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

লিপি

মিশরের লিপি ছিল ছবির লেখা। এই লিপিকে 'হায়ারোগ্লিফ' বলে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা তাদের মনের কথা প্রকাশ করত এই লিপির সাহায্যে। এক একটা কথা বোঝাতে এক একটা ছবি ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে তারা প্রত্যেক অক্ষরের জন্য আলাদা আলাদা ছবি ব্যবহার করত। তারা সব সমেত প্রায় ৭৫০টি ছবির লিপি ব্যবহার করেছিল। এই রকম অনেক ছবি প্রাচীন মিশরের মন্দিরে, রাজপ্রাসাদের দেয়ালে ও প্যাপিরাসের উপর পাওয়া গেছে। প্যাপিরাস থেকেই 'পেপার' (বা কাগজ) শব্দের উৎপত্তি। ফরাসী অধ্যাপক শাঁ পোলিয়েঁ ১৯২০ সালে এই ছবির পাঠ উদ্ধার করেন। তার ফলে আমরা প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছি।

রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী

মিশরের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাও। তাঁর অধীনে অভিজাত ব্যক্তিরা জমির মালিক হয়ে কৃষকদের মধ্যে জমি ভাগ করে দিতেন। তার বিনিময়ে শস্যের একটা অংশ কর হিসাবে কৃষককে দিতে হত। এই কর আদায়ের জন্য রাজকর্মচারী ছিল। কেউ খাজনা না দিতে পারলে এরা অত্যাচার করত।

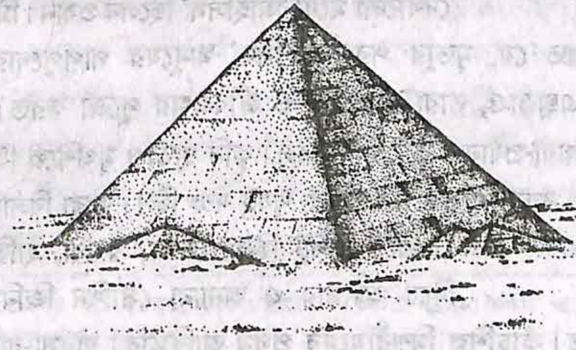
প্রাচীন মিশরে সরকারি কাজে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করতে হত। যুদ্ধের সময় ফ্যারাও এদের যুদ্ধের কাজে লাগাতেন। যুদ্ধ-বন্দীদের সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে পাঠানো হত। এমনকি, কৃষকদেরও যুদ্ধের সময়ে সৈনিক হিসাবে কাজ করতে হত। প্রাচীন মিশরে ক্রীতদাসদেরও যুদ্ধে ব্যবহার করা হত। কারণ, ক্রীতদাস ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল।

সেনাবাহিনী

সে যুগে মিশরীয়রা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব প্রভৃতি দেশে তারা কাচের বাসন, পাথরের পাত্র, কাপড়চোপড়, চামড়ার জিনিস নিয়ে যেত। ঐ সব দেশে এই সব জিনিসের খুব চাহিদা ছিল। বিভিন্ন দরকারি জিনিস ও বিলাসের জিনিস তারা অন্য দেশ থেকে আমদানি করত। উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য তারা দাঁড় ও পালযুক্ত জাহাজ ব্যবহার করত। সবরকম পণ্যের বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমে হত। ফ্যারাওরা বণিকদের উৎসাহ দিতেন এবং সকল প্রকার সাহায্য করতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

মিশরকে বলা হয় **পিরামিডের দেশ**। ফ্যারাও ও ধনীব্যক্তিদের পাথরে তৈরি সমাধিকে **পিরামিড** বলা হয়। এই পিরামিডের মধ্যে মৃতদেহকে মমি করে রাখা হত। চারকোণা ভিতের ওপর বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেঁথে পিরামিডগুলো তৈরি হত। দূর থেকে এগুলোকে



পিরামিড

ত্রিভুজের মত দেখাত। পিরামিডগুলোর মধ্যে খুফু, নেফরা ও মেনকুরা নামে তিনজন ফ্যারাও খুব বড় বড় তিনটে পিরামিড তৈরি করেন। এর মধ্যে খুফুর তৈরি করা পিরামিড সবচেয়ে বড়। এর উচ্চতা ৪৫০ ফুট। পরিধি ৭০০ ফুট। এই পিরামিডগুলো পৃথিবীর এক বিস্ময়। মিশরীয়রা মৃত্যুকে জীবনের শেষ বলে মনে করত না। মৃত্যুর পরেও মানুষের আর একটা জীবন আছে বলে তারা মনে করত। তাই তারা মৃতদেহকে ওষুধ মাখিয়ে, কাপড় জড়িয়ে 'মমি' করে রাখত। আর তার পাশে খাবার জিনিস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনা, রুপো, আসবাবপত্র রাখত। গিজের পিরামিডের কাছে পাথরের এক অদ্ভুত বিরাট মূর্তি আছে। একে 'স্ফিংস' বলা হয়। এর শরীর সিংহের আর মাথা মানুষের মত। এত বড় মূর্তি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

পিরামিড ও মমি



মমি

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের মধ্যেই থাকে। সেই জন্যই তারা বিভিন্ন মৃতদেহ রক্ষা করত। প্রাচীন মিশরীয়রা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবীরূপে পুজো করত। সূর্য দেবতা 'রা', নীলনদের দেবতা 'আসিরিস', থিব্স এর দেবতা 'আমন' ছিলেন তাদের উপাস্য। 'রা' ছিলেন সর্বপ্রধান দেবতা। মিশরের দেবীদের মধ্যে 'আইসিস' ছিলেন প্রধান। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর 'আইসিস' মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করতেন। এছাড়াও, তারা গাছপালা ও জীবজন্তুর পুজো করত।

ধর্মীয় বিশ্বাস

মিশরীয়রা প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। কৃষি ছাড়াও মৃৎশিল্পে মিশর খুব উন্নত ছিল। বয়ন শিল্পেও মিশরীয়রা খুবই দক্ষ ছিল। তারা বিলাসসামগ্রী তৈরিতেও পটু ছিল। সোনা, রুপো, হাতির দাঁত দিয়ে অলঙ্কার ও অন্যান্য সৌখিন জিনিস তারা তৈরি করত। কাঁচশিল্প মিশরীয়দের প্রথম আবিষ্কার। ব্যবসা-বাণিজ্যেও

কৃষি ও শিল্প

তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। এই বিদ্যায় তারা ছিল পারদর্শী। বহু মিশরীয় সৈনিকের পেশা গ্রহণ করত। লিপিকারদেরও মিশরে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ভাস্কর্যশিল্পে মিশরবাসীর অবদান অবিস্মরণীয়। প্রাচীন মিশরে বিজ্ঞান চর্চাও যথেষ্ট করা হ'ত। মিশরের জ্যোতির্বিদরাই সর্বপ্রথম দিনকে ২৪ ঘন্টায়, মাসকে ৩০ দিনে এবং বছরকে ৩৬৫ দিনে ভাগ করেন। ইমহোটপ নামে একজন চিকিৎসকের উল্লেখ প্রাচীন মিশরে পাওয়া যায়। তাঁকে মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসক।

● কী শিখলে ●

- 'মিশর নীলনদের দান' ও পিরামিডের দেশ।
- ফ্যারাও—তাঁর শাসন ব্যবস্থা—তিনিই ঈশ্বর।
- মিশরীয়দের আবিষ্কার - হায়ারো গ্লিফ, পেপার, পিরামিড, মমি, স্ফিংস্, কাঁচশিল্প, দিন, মাস ও বছরের ধারণা।
- মিশরের সমাজের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষি ও শিল্প।
- বাইরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য।
- মানুষের শোষণ - ক্রীতদাস ব্যবস্থা।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

● সিন্ধু সভ্যতা ●

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মত ভারতবর্ষেও প্রাচীন এক নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রায় একই সময়ে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের উর্বর উপত্যকায় এই সভ্যতা প্রথম গড়ে উঠেছিল। স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে প্রত্নবিজ্ঞানী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়োয়* মাটি খুঁড়ে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে (১৯২২ খ্রীঃ)। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে গড়ে উঠেছিল এই নগরী। প্রায় একই সময়ে সিন্ধুনদের উপনদী ইরাবতীর** পূর্ব পাড়ে হরোপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন

* লারকানা জেলায় 'মহেঞ্জোদাড়ো' এবং পাঞ্জাবের যে অঞ্চলে হরোপ্পা 'নগরী' গড়ে উঠেছিল, তা বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

** সিন্ধুনদের পাঁচটি উপনদীর নাম - শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা। এই পাঁচ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের নাম পাঞ্জাব।

প্রত্নবিজ্ঞানী দয়ারাম সাহানী। প্রত্নবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, যীশুর জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই প্রাচীন নগর সভ্যতা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিন্ধু উপত্যকার উত্তরে রূপাড় থেকে দক্ষিণে গুজরাটের লোথাল এবং পূর্বে গঙ্গানদীর উপত্যকায় কালিবঙ্গান পর্যন্ত কয়েক হাজার মাইল এলাকায় এ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। সিন্ধুনদের অববাহিকায় এই সভ্যতা গড়ে ওঠায় এই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা*** বলা হয়।



সীলমোহর

এই সভ্যতা হরোপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। একে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দ্রাবিড় সভ্যতা বলা হয়। জানা গেছে যে, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরোপ্পা নগরী দুটি ছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট শহর এবং অসংখ্য গ্রাম এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। গ্রামগুলি ছিল আরও প্রাচীন। সুমের ও মিশরের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অন্য অঞ্চল থেকে আসা যাযাবর মানুষেরা। সিন্ধু সভ্যতার বহুকাল পরে ভারতবর্ষে গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল আর্যরা। তারাও এসেছিল ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

হরোপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর মাটির নিচে খুঁজে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে এই দুটি নগরীর পরিকল্পনা, নগরীর রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার নানা বিচিত্র ইতিহাস জানা গেছে।

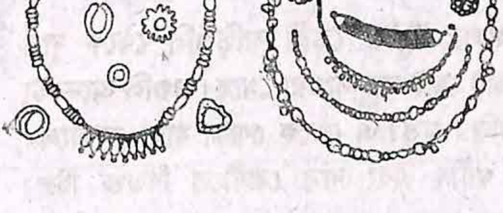
দুটির নগরীই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। নগরীর রাজপথগুলি ছিল ত্রিশ ফুট চওড়া। রাজপথের দুধারে ছিল ইঁটের তৈরী বাড়ির সারি -

*** প্রাচীন পারসিক ও গ্রীকরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতো। তাই সিন্ধুকে বলতো 'হিন্দু'। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এই 'হিন্দু' নাম থেকেই মুসলীম শাসকেরা এই দেশের নাম দেয় হিন্দুস্থান।

কোন কোনটা আবার দোতলা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কুয়ো ও নর্দমা ছিল। বাড়ির নর্দমার জল নগরীর বড় রাস্তার নিচে বাঁধানো নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যেত। বড় রাস্তার নর্দমা-গুলি ঢাকা থাকতো এখনকার দিনের নগরে যেমন দেখা যায়। মহেঞ্জোদাড়োতে একটি বিশাল স্নানঘর পাওয়া গেছে। স্নানঘরের মধ্যস্থলে বাঁধানো পুকুর ছিল। পুকুরের জল বার করে নতুন জল ভরার ব্যবস্থা ছিল। হরোপ্পায় একটি বিশাল শস্যের গোলা পাওয়া গেছে।


নারীমূর্তি

এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব, শুঁটি ও তিল। ধানের চাষ তাদের জানা ছিল না। ভেড়া ও শুয়োরের মাংস, মাছ ও ডিম ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। হরোপ্পায় তুলোর চাষ হতো। সুতীর তৈরী কাপড় ব্যবহৃত হতো। তবে পশমের কাপড়ও তারা ব্যবহার করতো। নারী-পুরুষ উভয়েই নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করতো। কারিগররা সোনা, রূপো, তামা, হাতির দাঁত, উজ্জ্বল পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য জানতো। কুমোরেরা নানা আকৃতির মাটির পাত্র, খেলনা ইত্যাদি তৈরী করতো। তামা, ব্রোঞ্জ ও চিনামাটির পাত্রও তারা তৈরী করতে জানতো। লোহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

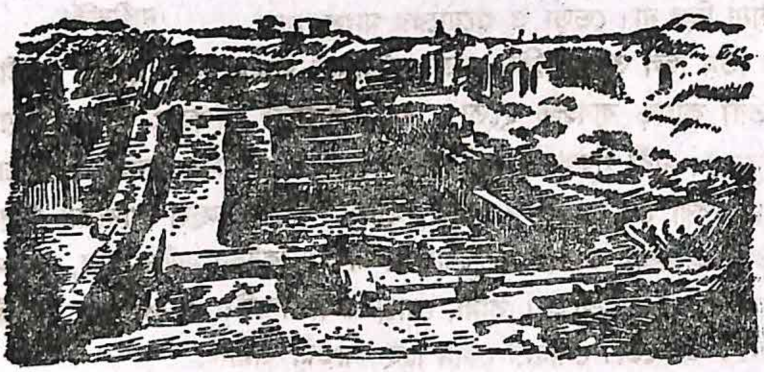

অলংকার সামগ্রী

সিন্ধু উপত্যকায় অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষ-আবাদ। চাষ আবাদ ছাড়াও কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতোর ইত্যাদি অসংখ্য কারিগর নানা ধরনের পেশায় নিযুক্ত ছিল। কারিগররা ছিল

খুবই দক্ষ। মাটির নিচে পাওয়া খেলনাগুলি দেখলে অবাক হতেই হয়।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। চাকা লাগানো গাড়ি ও নৌকো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করা হতো। সিন্ধু উপত্যকার কারিগরদের তৈরী জিনিস সুমেরের বাজারে বিক্রী হতো। এছাড়াও, মাছ ধরার পেশাতেও অনেকে নিযুক্ত ছিল। তামার তৈরী মাছ ধরার অসংখ্য বঁড়শি পাওয়া গেছে। মাছ ও অন্যান্য নানা পণ্যসামগ্রী বিক্রীর একটি বড় বাজার ছিল মহেঞ্জোদাড়োতে। মহেঞ্জোদড়োতে বাজারের ধ্বংস চিহ্ন পাওয়া গেছে।

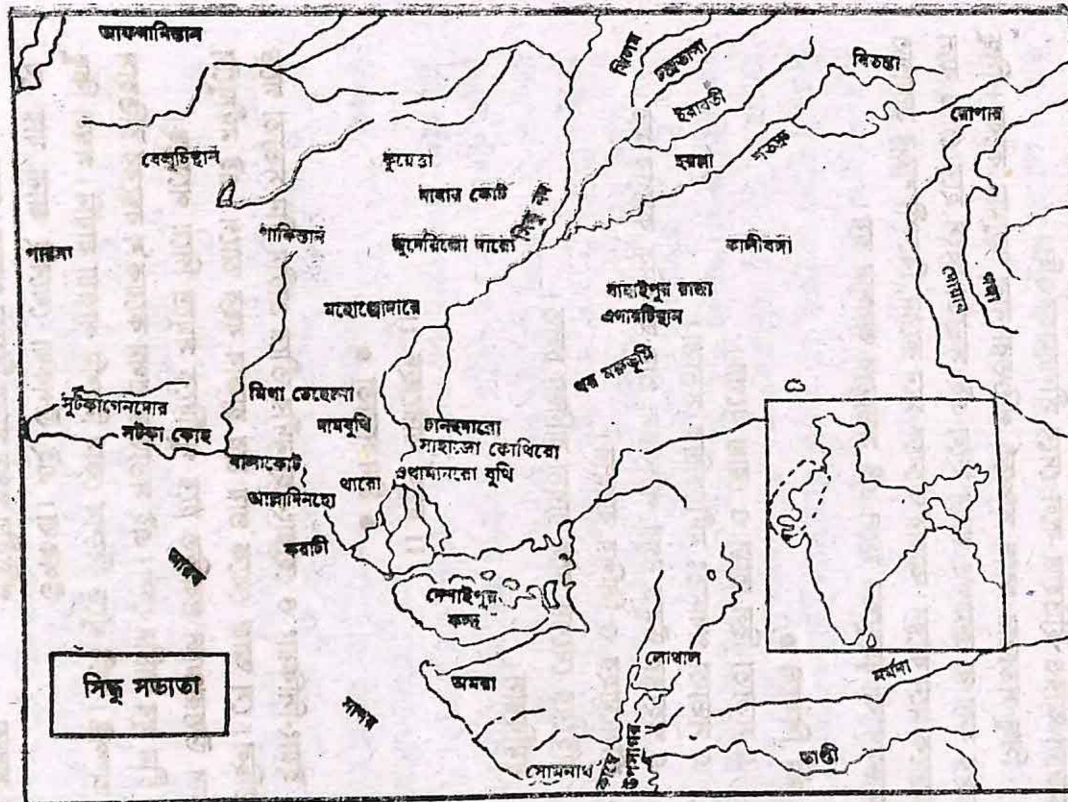
মহেঞ্জোদাড়োতে পোড়া মাটির মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। ধ্যানমগ্ন এক যোগী পুরুষের মূর্তি ও খোদাই করা সীলমোহরের সন্ধানও পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা মনে করেন, তখন থেকেই মাতৃপূজা ও পশুপতি শিবের



শহরের ধ্বংসাবশেষ

পূজোর প্রচলন ছিল।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরোপ্পায় ইঁটের তৈরী বাড়িগুলি থেকে দূরে পাঁচিলের বাইরে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর পাওয়া গেছে। এগুলি অনেকটা এখনকার দিনের শহরের বস্তির মত। এ থেকে বোঝা যায়, সেকালের ভারতীয় সমাজ ধনী ও গরীব এবং দাস শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মহেঞ্জোদাড়োর বিশাল স্নানঘর সাধারণ লোকেরা ব্যবহার করত। ধনীদের বাড়িতেই স্নানঘর থাকতো। বণিক ও ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য


আফগানিস্তান
বেলুচিস্তান
পাকিস্তান
মহেঞ্জোদারো
চানহুদারো
করাচী
থর মরুভূমি
কালীবঙ্গা
বিতস্তা
ইরাবতী
শতদ্রু
যমুনা
গঙ্গা
লোথাল
সোমনাথ
নর্মদা
তাপ্তী

সিন্ধু সভ্যতা

একরকম শীলমোহর ছিল। এগুলিতে একরকম লিপি খোদাই করা আছে। এই ধরনের প্রায় দুই হাজার শীলমোহর পাওয়া গেছে। এই লিপিগুলি আজও পড়তে পারা যায়নি। যেদিন তা সম্ভব হবে সেদিন সিন্ধু সভ্যতার অজানা আরও ইতিহাস বলে দেবে সীলমোহরগুলি।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস সম্পর্কে পণ্ডিতরা নানা অনুমান করেন। সিন্ধু নদের বন্যা বা ক্রমাগত খরার ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, বিদেশী শত্রুর ক্রমাগত আক্রমণ বা গৃহযুদ্ধের ফলে এই সভ্যতার অবসান হয়।

- **কী শিখলে** ঃ
- এ সভ্যতা ছিল তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের।
- এ সভ্যতা প্রধানতঃ নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।
- এ শহরের উন্নত নগর পরিকল্পনা প্রায় আধুনিক কালের মত।
- শীলমোহর ও লিপির ব্যবহার।
- বাইরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।
- ধর্মবিশ্বাস।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।
• চীন-সভ্যতা •

ইয়াং-সিকিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর তীরে প্রাচীন চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। এই নদীদুটো চীনের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

চীন খুব প্রাচীন দেশ। এই সভ্যতার প্রথম কয়েক'শ বছরের ইতিহাস খুব অস্পষ্ট। মাটি খুঁড়ে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সম্বল কিছু উপকথা। এই উপকথা থেকেই জানা যায় যে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন পান্‌কু। তবে এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সবটাই কল্পনা ভিত্তিক।

আদি সভ্যতা

অনুমান করা হয়, চীনবাসীরা প্রথমে এই দুই নদীর পাড়েই বসবাস করত। পরে তারা ছড়িয়ে পড়ল। এদের একটা অংশ চাষবাস করত। আর

একটা অংশ যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত। যারা চাষবাস করত, তারা নদীর ধারে ঘরবাড়ি তৈরি করে সভ্য মানুষে পরিণত হয়। তারা পশুপালনও করত। মাটির জিনিস, রেশমের কাপড়, চাকা দেওয়া গাড়ি, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র তারা তৈরি করতে জানত। লাঙ্গল দিয়ে তারা জমিতে চাষ করত। নদী থেকে খাল কেটে জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করত। নদীর বন্যাও ঠেকাত। এ সবই উপকথা থেকে জানা। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে তারা শহর তৈরি করতে আরম্ভ করে। শহরকে যাযাবরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উঁচু পাঁচিল দিত। ঐ যুগের লোকেরা এক ধরনের ক্যালেণ্ডার তৈরি করেছিল। এক ধরনের লিপিও তারা আবিষ্কার করে। ঐ লিপিগুলো ছিল মিশরীয় লিপির মত ছবির লেখা। পাতলা কাঠ, হাড়, সিল্ক ও বাঁশের উপর প্রাচীন পুঁথি লেখা হত। চা তারা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করত।

উপকথা

প্রাচীন চীন হচ্ছে উপকথার দেশ। উপকথায় আছে প্রথম মানুষ পান্‌কু। তিনি আঠারোশ' বছর ধরে আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেন। তারপরে তৈরি করেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র। পৃথিবী সৃষ্টির পরে স্বর্গ থেকে পাঁচজন সম্রাট পৃথিবীতে আসেন। প্রথম রাজা ফুসি দেশের মধ্যে ছবি আঁকা, গান, পশুপালন, মাছধরা ও কাপড় বোনা শেখান। দ্বিতীয় রাজা শেন নুং চাষের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা শেখান। তৃতীয় রাজা হুয়াংটি ঘরবাড়ি তৈরি ও জ্যোতির্বিদ্যা শেখান। চতুর্থ রাজা দেন ধর্মশিক্ষা। শেষ রাজা ছিলেন ইয়াও। ইনি হোয়াং-হো নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। এ সবই উপকথা থেকে পাওয়া যায়।

সাং-চৌ-বংশ

খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক আঠারোশ' বছর আগে সাং বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। মাটি খুঁড়ে সাং রাজাদের রাজধানী ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই বংশের আমলে সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। সাং বংশের পরে চৌ বংশ চীনে রাজত্ব করে। এই বংশের রাজত্বকালে মহাপুরুষ কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন।

● কী শিখলে ●

- বহু শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনে সভ্যতা গড়ে উঠেছে।
- উপকথাই একমাত্র সভ্যতার কথা বলে - যা কল্পনাভিত্তিক।

— পঞ্চম পরিচ্ছেদ —

● নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ●

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো ছিল নদীকেন্দ্রিক। এই নদী উপত্যকায় প্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চীনের সভ্যতা। এই সভ্যতাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অমিল থাকলেও এদের মধ্যে মিল অনেক। এই মিলগুলোই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

কৃষি

নদীর তীরে সেদিনের মানুষ বসতি গড়ে তুলেছিল চাষবাসের সুবিধার জন্য। সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল প্রধানত কৃষিকে কেন্দ্র করে। তারা খাল কেটে অনুর্ব্বর জমিতে নদীর জল নিয়ে যেত চাষের জন্য। আবার ফসলকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ও অন্য প্রয়োজনে জল জোগাতে বাঁধ তৈরি করত। নদীর তীরবতী পলি জমি ছিল খুব উর্ব্বর। প্রচুর ফসল হত। মানুষের খাদ্যের অভাব ঘটত না। তাছাড়া, নদী মানুষের নানা প্রয়োজনও মেটাত। তার জন্য এখানে লোকবসতি বাড়ত। ফলে নদীকে কেন্দ্র করে গ্রাম ও নগর গড়ে উঠত। পরবর্তীকালে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। পশুপালনও ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ ছিল এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃৎশিল্পে, বয়নশিল্পে ও ধাতুশিল্পে এই সভ্যতাগুলো ছিল খুবই উন্নত। চিত্র শিল্পেও তারা উন্নত ছিল। সমাজে কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, সেকরা প্রভৃতি বৃত্তির লোক ছিল। বৃত্তির ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ছিল এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাণিজ্য ও যাতায়াতের মাধ্যম ছিল নদী। নদীপথেই পালতোলা বড় বড় নৌকা করে দেশ-বিদেশে মানুষ বাণিজ্য করতে যেত। সাধারণত বিনিময় প্রথায় লেনদেন চলত। স্থলপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য হত। সমাজে বণিকদের খুব

প্রাধান্য ছিল।

ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়েও ঐ সভ্যতাগুলোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল। প্রাকৃতিক শক্তি, উদ্ভিদ ও পশুপাখিকে সেই যুগের মানুষ পুজো করত। প্রায় একই ধরনের মাতৃদেবীর পুজো সে যুগে প্রচলিত ছিল। বহু দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ছিল ঐ যুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিত শ্রেণী বিভিন্ন সভ্যতায় সমাজে বিশেষ আসন লাভ করেছিল। সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুতেই জীবনের সব শেষ হয়ে যায় না।

ধর্ম

লিপির প্রচলন ছিল এই সভ্যতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার জন্য তারা বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চিহ্নগুলো ছিল ছবিতে। এই লিপিতে তারা বইও লিখত। একমাত্র সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি।

লিপি

প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের একটা বড় অংশ নগরে বাস করত। নগরগুলো ছিল সুরক্ষিত। নগরের শাসন ব্যবস্থাও ছিল উন্নত। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব খুব বেশি ছিল। অভিজাত ধনীদেরও সমাজে যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তারা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। আর্থিক উন্নতির সুযোগ গরিবরা ভোগ করতে পারত না। সাধারণ মানুষের জীবনও খুব সুখের ছিল না। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সভ্যতায় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল।

● কী শিখলে ●

- নদীমাতৃক বিভিন্ন সভ্যতায় অমিল থাকলেও মিল অনেক ছিল।
- কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম, লিপি ও নানা ক্ষেত্রে নানা উন্নতি ঘটে।
- শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল।

অনুশীলনী

চতুর্থ অধ্যায়

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

● মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ●

১। দু'এক কথায় লেখ :

(ক) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কী?

(খ) মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের কী বলা হত?

(গ) মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কারা ছিল?

(ঘ) সুমেরীয় লিপি দেখতে কেমন?

(ঙ) 'সুমার' শব্দের অর্থ কী?

(চ) সুমেরীয় সভ্যতার লিপিকে কী বলা হতো?

(ছ) এ সভ্যতা কোন যুগের?

(জ) কোন নগরকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(ঝ) কিসের টাকার সাহায্যে লেনদেন চলত?

(ঞ) এ সভ্যতা কত হাজার আগে গড়ে উঠেছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

(ক) টেল্ কাকে বলে?

(খ) খেজুর গাছকে "জীবনবৃক্ষ" বলার কারন কি?

(গ) 'মেসোপটেমিয়া' কথার অর্থ কি?

৩। রচনাধর্মী উত্তরমূলক প্রশ্ন :

(ক) নদীর বন্যা রোধ করতে এবং সেচের জন্য সুমেররা কী কী ব্যবস্থা করে?

(খ) সুমেরের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান পেশা কী ছিল?

(গ) সুমেরের শহর-জীবন কেমন ছিল?

(ঘ) ঐ সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেখাপড়ার অবস্থা কিরূপ ছিল?

(ঙ) স্থাপত্য ও শিল্পে তারা কতটা উন্নতি করেছিল?

৪। বাক্যগুলি শুদ্ধ করে লেখ :

(ক) বর্তমানের ইরান দেশকে মেসোপটেমিয়া বলা হয়।

(খ) মেসোপটেমিয়ার উত্তরের অংশকে বলা হয় সুমেরিয়া।

(গ) ঐ সভ্যতায় নগরগুলো ছিল পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

(ঘ) তারা দস্তা, লোহা ও সোনার তৈরী জিনিস তৈরী করত।

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

● মিশরীয় সভ্যতা ●

১। দু'এক কথায় লেখ :

(ক) মিশর দেশটি কোথায়?

(খ) মিশরের রাজাকে কী বলা হতো?

(গ) মিশরের লিপির নাম কি?

(ঘ) মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার কে করেন?

(ঙ) দ্বিতীয় রামেসিস কে ছিলেন?

(চ) মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি কে তৈরি করেন?

(ছ) মিশরের বিরাট পাথরের মূর্তিকে কী বলা হয়?

(জ) পিরামিডের আকৃতি কী ধরনের?

(ঝ) কাগজের নাম কিভাবে এসেছে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

(ক) মিশরকে কেন 'নীলনদের দান' বলা হয়?

(খ) মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতা কিরূপ ছিল?

(গ) মিশরীয় লিপির সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

(ঘ) মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

(ঙ) পিরামিড কেন তৈরি করা হতো?

(চ) মিশরীয়দের মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে কী বিশ্বাস ছিল?

(ছ) মৃতদেহকে কিভাবে তারা রক্ষা করতো?

(জ) মিশরীয়দের পেশা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

(ঝ) সুমেরের লিপি এবং মিশরীয় লিপির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

(ঞ)মিশর ও সুমেরের অধিবাসীদের পেশার মধ্যে কী কী মিল দেখা যায়?

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) মিশরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত— ভারত/সাহারা মরুভূমি/লোহিত সাগর/ পশ্চিমবঙ্গ।

(খ) মিশরের লোকেরা মতামত প্রকাশ করত— হরফ লিপির সাহায্যে/মন্দিরে নকসা করে/অঙ্গভঙ্গি করে/ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

(গ) দাঁড় ও পাল যুক্ত জাহাজ ব্যবহার করেছিল—আদিম মানুষেরা /মিশরের মানুষেরা/পুরোহিতরা/ক্রীতদাসেরা।

(ঘ) মিশরীয়দের প্রথম আবিষ্কার ছিল— হাতির দাঁতের জিনিস

/পাথরের অলঙ্কার/ কাচের তৈরি জিনিস/তামার জিনিসপত্র।

৩। সঠিক শব্দটি বসাও :

(ক) মিশরের আবহাওয়া ছিল————————।

(খ) পুরোহিতরা ———————— তৈরী করতেন।

(গ) মিশরে প্রাচীনকালে ———————— ব্যবস্থা চালু ছিল।

(ঘ) মিশরের প্রধানতম চিকিৎসক ছিলেন ————————।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

● সিন্ধু সভ্যতা ●

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কার করেন— ফ্যারাও/রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় /অশোক/মেগাস্থিনিস।

(খ) সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ ছিল— ঐ এলাকার মানুষদের পলায়ন/ ভূমিকম্প/খরা/ বৃক্ষরোপণ।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) কতদিন আগে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(খ) ঐ সভ্যতা কী ধরনের ছিল?

(গ) ঐ সভ্যতায় কোন খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার হতো?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) ঐ সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল?

(খ) ঐ সভ্যতার কৃষিকাজ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

(গ) এ সভ্যতার সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সিন্ধু সভ্যতার লোকেদের ধর্ম বিশ্বাস কি ধরনের ছিল?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) ঐ সভ্যতার লোকেদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

● চীন-সভ্যতা ●

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) চীন-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল— গঙ্গা নদীর তীরে/ইয়াং-সিকিয়াং নদীর তীরে/যমুনা নদীর তীরে/ভাগীরথী নদীর তীরে।

(খ) উপকথা অনুযায়ী প্রথম রাজা ছিলেন— হর্ষবর্ধন/রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়/ফুসি/ ফ্যারাও।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) কোন কোন নদীর তীরে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(খ) কত হাজার বছর আগে এ সভ্যতা দেখা যায়?

(গ) উপকথা মতে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে?

(ঘ) কনফুসিয়াস কোন বংশের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) চীনে কিভাবে সভ্যতা গড়ে ওঠে?

(খ) তাদের লিপিগুলি কি ধরনের?

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

● নদীমাতৃক সভ্যতা ●

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) নদীমাতৃক সভ্যতার কৃষি/শিল্প বাণিজ্য/ধর্ম/লিপি/সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(ক) নদীমাতৃক সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির দুটি দিকের ব্যাখ্যা কর।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

● লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ●

আবিষ্কার

আমরা এর আগে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের কথা পড়েছি। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ লোহা আবিষ্কার করে। পশ্চিম এশিয়ার আর্মেনিয়ান পর্বতমালা অঞ্চলের হিটাইট নামে মানুষেরা প্রথম লোহা আবিষ্কার করে বলে অনেকে মনে করেন। এই লোহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার এক নতুন যুগ শুরু হয়। এই লোহা আবিষ্কারের পর মানুষের জীবনযাত্রা আরো উন্নত হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন

লোহা আবিষ্কারের আনুমানিক তিনশো বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। লোহা দিয়ে মানুষ অনেক ধারাল হাতিয়ার তৈরি করতে থাকে। যে দেশে বেশি লোহা পাওয়া গেল সেই দেশ অনেক বেশি লোহার হাতিয়ার তৈরি করে শক্তিশালী হয়ে উঠল। শুধু হাতিয়ারই নয়, লোহা দিয়ে মানুষ দরকারি যন্ত্রপাতি তৈরি করল। চাষবাসের জন্য লাঙ্গল তৈরি করল। কৃষিতে এক বিরাট পরিবর্তন এল। উন্নত ধরনের লোহার যন্ত্রপাতিতে উৎপাদন বাড়ল। চাষী অনেক বেশি ফসল উৎপন্ন করল। তাঁতী, কামার, ছুতোর--তারা শুধুমাত্র তাদের বৃত্তি ছাড়া অন্য কাজ করত না। চাষীরাই শুধু চাষবাস করত। সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ আরও দৃঢ় হল। যানবাহনের উন্নতি হল। ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধি এল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে লোহার উপকারিতা অতীতের মত আমরা আজও উপলব্ধি করি। সেই যুগের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট বেড়ে যায়। যে দেশ শক্তিশালী হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হয়, সেই দেশের অভিজাত শ্রেণী ভোগবিলাসের জীবন কাটাতে

থাকে। এই যুদ্ধ আর এক সমস্যার সৃষ্টি করে। বিজয়ী দেশের শাসক ও অভিজাত শ্রেণী যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এইভাবে ক্রীতদাস প্রথা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগে এই ক্রীতদাসদের পরিশ্রম দিয়েই গড়ে উঠেছিল লৌহ যুগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ। এই দাসদের উপর বণিক শ্রেণীর নিষ্ঠুর অত্যাচার একদিন ক্রীতদাসদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিল। ফলে ক্রীতদাসেরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের লড়াই এই যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগেও রাজারা ছিলেন। তাঁরা ছোট ছোট রাজ্য বা নগররাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। তখনকার দিনে রাজারা প্রজাদের রক্ষা করতেন, শান্তি-শৃঙ্খলা দেখতেন, বাইরের শক্তির আক্রমণকে প্রতিরোধ করতেন। প্রজার আনুগত্য ছিল সে যুগের রাজশক্তির ভিত্তি। লৌহ যুগে অবস্থা একেবারে বদলে গেল। শুরু হল বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই। শক্তিশালী রাজ্য দুর্বল রাজ্যকে অস্ত্রের জোরে পদানত করল।

রাজশক্তির উদ্ভব

রাজ্য বড় হল, শক্তিশালী হল। রাজা হলেন প্রবল শক্তিমান, সমস্ত কিছুর তিনি উর্ধ্বে। লুণ্ঠিত সামগ্রী সব রাজকোষে জমা হল। রাজার হাতে প্রচুর ধনসম্পদ এল। রাজশক্তিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য রাজা অনেক আইন তৈরি করলেন। এই ভাবে ছোট ছোট রাজ্যের রাজা বা গোষ্ঠীপতিদের জায়গায় বড় বড় রাজ্য ও শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব ঘটল। গোষ্ঠীপ্রধান শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে প্রকৃত শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের সূচনা হল। কিন্তু এই রাজতন্ত্র খুব সহজভাবে এগোতে পারেনি। শাসন ক্ষমতাকে অধিকার করবে এই নিয়ে সে যুগে বার বার রাজা ও পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বেধেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজারাই জয়ী হয়েছিলেন। শক্তিশালী রাজতন্ত্র ও শক্তিশালী রাষ্ট্র লৌহ যুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

● কী শিখলে ●

- লৌহের আবিষ্কার ও ব্যবহার সমাজ ও সভ্যতাকে অনেক এগিয়ে দেয়।
- ক্রীতদাসের শ্রম ও তাদের শোষণ এ যুগের উন্নতির প্রধান হাতিয়ার।

● বড় বড় রাজ্য, সাম্রাজ্য ও শক্তিশালী রাজাদের উৎপত্তি এবং যুদ্ধের সূচনা হয়।

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

'ক'

● ব্যাবিলন ●

আমরা এর আগে মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার কথা জেনেছি। এই সুমাররা ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে বাস করত। সুমারদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির সুযোগে আক্কাদ দেশের লোকেরা তাদের রাজ্য দখল করে নিয়েছিল তাও জেনেছি। এ সব আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের ঘটনা। আক্কাদেরা নগররাষ্ট্রের বদলে একটা ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে অপর একটি জাতি ঐ রাজ্য আক্রমণ করে ও শেষে অধিকার করে। এই নতুন জাতির একজন রাজা ছিলেন হামুরাবি। তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মিলন ঘটে। এই রাজ্যের রাজধানী হয় ব্যাবিলন। কিছুকালের মধ্যেই ব্যাবিলন উন্নত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহাই ইতিহাসে ব্যাবিলনের সভ্যতা নামে খ্যাত।

ব্যবিলনের সভ্যতা

এরপর আসিরীয় নামে একটি জাতি ব্যাবিলন রাষ্ট্র দখল করে এবং নিনেভ শহরে রাজধানী স্থাপন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তারাও শিক্ষা, চিকিৎসা শাস্ত্র ও নানা বিষয়ে উন্নতি করেছিল। চারশ বছর পর কালডিয়া গোষ্ঠীর আমলে ব্যবিলনের প্রাচীন গৌরব আবার ফিরে আসে। এই সময় শক্তিশালী রাজা ছিলেন দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হোল 'ঝুলন্ত উদ্যান' যা সে সময়ের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু ছিল। তাঁর বিরাট প্রাসাদের থামের ওপর মাচা তৈরী করে কৃত্রিম পাহাড় ও ঝুলন্ত উদ্যান তৈরী হয়।

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার মাটি ছিল উর্ব্বর। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে যব ও গম উৎপন্ন হত। খেজুরও প্রচুর হত এখানে। খেজুরই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। এই রাজ্য প্রাকৃতিক

সম্পদে পূর্ণ ছিল। ব্যাবিলনবাসীরা এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ছিল। গৃহপালিত জীবজন্তুদের খাদ্যের অভাব ঘটত না। তারা নদীতে বাঁধ দিয়ে খাল কেটে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করত। তারা কৃষিকে খুবই গুরুত্ব দিত এবং কৃষির উন্নতি করেছিল। জমি ছিল তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। জমির মালিকরাই সাধারণভাবে জমি চাষ করত। ব্যাবিলনীয়রা পৃথিবীর নানান দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তুলো ও পশমের কাপড়, খাদ্যশষ্য প্রভৃতি সিন্ধুদেশ, গ্রীস, রোম, এশিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করত। জিনিসপত্র ওজনের জন্যে তারাই প্রথম বাটখারার প্রচলন করল। ব্যবসা বাণিজ্য নদীপথে চলত। নৌকাই ছিল প্রধান অবলম্বন। বিনিময় প্রথায় জিনিসপত্রের কেনাবেচা চলত।

ব্যাবিলনবাসীরা বহু দেবদেবীর পুজা করত। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন মার্দুক। মার্দুকের বিশাল মন্দিরের কারুকার্য ছিল দেখবার মত। এছাড়া, অসংখ্য দেবদেবীও ছিল, মন্দিরও ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের নিজস্ব কোষাগার ছিল। এই মন্দিরগুলোর পুজারী ছিলেন পুরোহিত-শ্রেণী। এই পুরোহিতরা ছিলেন ধনী। এঁদের ক্ষমতাও ছিল খুব। পুরোহিতরা মন্দিরের আয়ে সুখে সচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন। তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য ও চাষবাসের কাজে টাকা দিতেন। এমনকি সুদেও টাকা ধার দিতেন। বিচার ও শিক্ষার দায়িত্ব ছিল এই পুরোহিতদের উপর। জনসাধারণের ওপর এঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি রাজার চেয়েও বেশি ছিল। তাঁরা রাজার চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন। যদি রাজা তাঁদের বিরোধিতা করতেন তাহলে তাঁদের সিংহাসন ছাড়তে হত।

ধর্ম ও পুরোহিত

প্রাচীন ব্যাবিলন ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। পুরোহিতদের নেতৃত্বেই সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটে। গণিতশাস্ত্রে তাঁদের গভীর জ্ঞান ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তারা উন্নত ছিল। তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী পাঁচটা গ্রহ আবিষ্কার করেছিল। ব্যাবিলনবাসীরা পঞ্জিকা তৈরি করেছিল। তারা দিন, মাস ও বছরেব হিসেব করতে জানত। প্রাচীন ব্যাবিলনে চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

হত। তারা গান-বাজনা খুব ভালবাসত। তারা কয়েকটা বাদ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। তারা কবিতা ভালবাসত। 'গিলগামেসের কাহিনী' ছিল তাদের প্রিয় মহাকাব্য। পৃথিবীর প্রথম পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল ব্যাবিলনে।

হামুরাবি বিধি

ব্যাবিলনে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল দেশের জন্য আইন প্রণয়ন। প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে যারা দেশের প্রচলিত আইন-কানুনগুলি সঙ্কলন করেন তাদের মধ্যে হামুরাবি অন্যতম। তাঁর আইনগুলি একটি পাথরের গায়ে খোদাই করে রাখা হয়েছিল। ১৯০২ সালে ইরানের সীমান্তে সুসা নগরে পাথরটি খুঁজে পাওয়া গেছে। কৌণিক লিপিতে ২৮৫টি আইন খোদাই করা আছে। এগুলি পড়ে বোঝা যায় কাদের সুবিধা হয়েছিল এই আইনে। ব্যাবিলনের সমাজ জীবনেরও ধারণা পাওয়া যায় আইনগুলি পড়ে।

আইনে বলা ছিল—খুনের অভিযোগ এনে প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারীর ফাঁসী হবে। মন্দির বা প্রাসাদ থেকে চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। চোর বা ডাকাতকে ধরা না গেলে সরকারী কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দেবার বিধি ছিল। ডাকাতের হাতে খুন হলে তার নিকট আত্মীয়কে এক মিনা (প্রায় ৩০০০ টাকা) দেওয়ার নির্দেশ ছিল। টাকা ধার করে শোধ না দিতে পারলে ঋণগ্রহীতার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে অন্তত তিন বছরের জন্য দাস শ্রমিক হয়ে কাজ করতে হতো। ধনীব্যক্তিকে চড় মারার অপরাধে একজন সাধারণ মানুষকে ষাট ঘা চাবুক মারা যেত; একজন ধনী ব্যক্তিকে ঐ একই অপরাধের জন্য শুধু জরিমানা দিতে হতো।

হামুরাবির আইনবিধি থেকে সেযুগের ব্যাবিলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল-- শাসক শক্তি, মধ্যবিত্ত ও ক্রীতদাস। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে

সমাজ

কৃষক ও ব্যবসায়ীরাও পড়ত। কৃষিকাজ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সমাজ জীবনের প্রধান অবলম্বন। সমাজে সব শ্রেণীর মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল। ফৌজদারী আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু সাধারণভাবে এই আইনবিধিতে গরিবের

স্বার্থ উপেক্ষিত ও ধনীদের স্বার্থ রক্ষিত ছিল।

● কী শিখলে ●

- এ সভ্যতা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
- প্রকৃতির সম্পদকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে শ্রম ও বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- নানা মানুষের দানে এ সভ্যতা সমৃদ্ধ।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতা পৃথিবীকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেঃপাঁজি, বাটখারা, গ্রহ, পাঠাগার, আইনবিধি রচনা প্রভৃতি।
- যে কোনো সভ্যতার মতো এ সভ্যতা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলে ছিল।

'খ'

● মিশর সাম্রাজ্য ●

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে মিশর স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। তারপর মিশরের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে দুর্বল হতে লাগল। ফলে মিশরের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

হিকসস্‌দের মিশর অধিকার

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে আবার মিশর ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। সেই সময় মিশরে ব্যবসা বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। জলসেচ ব্যবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে প্রচুর উৎপাদন বেড়ে যায়। কিন্তু গরিবের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। ক্রীতদাসেরাও নির্মম অত্যাচার সহ্য করত। কিন্তু অত্যাচারিত মানুষের সহ্যের বাঁধ একদিন ভেঙে গেল। তারা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের শক্তি ও ব্যাপকতা ফ্যারাও-এর ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিল। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। এই সুযোগে হিকসস্‌ নামে এক যাযাবর জাতি মিশর আক্রমণ করল। এই আক্রমণ প্রতিরোধে ফ্যারাও ব্যর্থ হলেন। মিশর হিকসসদের অধিকারে চলে এল। হিকসসরা প্রায় দুশো বছর ধরে মিশর শাসন করে। মিশরবাসীদের উপর হিকসসদের অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলল। শেষে এই অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে মিশরে লড়াই শুরু হল। দীর্ঘ লড়াইয়ের

পর মিশরের মানুষ হিকসসদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। এই হিকসসদের কাছ থেকে মিশরীয়রা ঘোড়া ও যুদ্ধরথের ব্যবহার শিখে নিয়েছিল। নতুন নতুন অস্ত্রও ব্যবহার করতে শিখেছিল। হিকসস্ বিতাড়নের পর মিশরে নতুন যুগ শুরু হল।

হিকসস্ বিতাড়নে ফ্যারাও প্রথম আথমাজ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মিশরে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। তবে মিশরে নতুন যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৃতীয় থুটমোস। এই বংশের ফ্যারাওদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কোন দেশ যখন সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়, তখন সে পররাজ্য জয় করতে চায়।

সাম্রাজ্য বিস্তার

মিশরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তৃতীয় থুটমোস এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পশ্চিম এশিয়ায় তিনি বার বার অভিযান করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া জয় করেন। সাইপ্রাস ও ক্রীটের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। স্থলযুদ্ধে ও নৌযুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। তাঁর পরবর্তীকালে তৃতীয় আমেনহোটেপ নামে আর এক শক্তিশালী ফ্যারাও মিশরে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে রাজধানী থিবস্ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল। চতুর্থ আমেনহোটেপও একজন যোগ্য ফ্যারাও ছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে এই বংশের পতন হয়। পরবর্তী বংশের ফ্যারাওদের মধ্যে দ্বিতীয়



ফ্যারাও

রামেসিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলে মিশরের গৌরব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় রামেসিসের পর মিশর আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে উপনিবেশগুলো মিশরের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পারস্য মিশর অধিকার করে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে মিশরে ধর্মের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন

দেখা দেয়। পুরোহিতরা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী। সমাজে তাঁদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে। আইন রচনা করতেন তাঁরাই। তাঁরা বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বেও ছিলেন। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, পুরোহিত শ্রেণী ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ফ্যারাওদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন পুরোহিতরা।

পুরোহিত শ্রেণী

থিবস্-এর আমন দেবতার মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন মিশরের প্রধান পুরোহিত। পুরোহিতরা প্রত্যেকটি মন্দিরে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের জন্য ফ্যারাও প্রচুর অর্থ পুরোহিতদের হাতে দিতেন। পুরোহিতদের জমিতে হাজার হাজার শ্রমিক বেগার খাটত। ক্রমে পুরোহিতদের ক্ষমতা ফ্যারাওদের ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যায়। দূর্বল ফ্যারাও নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতেন পুরোহিতরা। এঁরা ভোগ বিলাসে জীবন কাটাতেন। ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ পুরোহিতদের দমন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টার বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ প্রজারা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের ফলে তাঁর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। পুরোহিতরা আবার নিজেদের ক্ষমতা ফিরে পায়। শেষ পর্যন্ত ফ্যারাও ও পুরোহিতদের ক্ষমতার লড়াইয়ে পুরোহিতরাই জয়ী হন। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে মিশর; শিল্প, স্থাপত্য ও কারুকার্যে উন্নতি করেছিল।

• কী শিখলে •

- এ সভ্যতা ছিল তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
- মিশরের সভ্যতাও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছিল। সেখানে নানা সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে নানাভাবে।
- ফ্যারাওদের সঙ্গে পুরোহিতদের সংঘর্ষে পুরোহিতদের জয়লাভ হয়।
- প্রাকৃতিক শক্তি, নদী ও ভূমিকে কাজে লাগিয়ে সংগ্রাম করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে।
- মিশরে বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

'গ'

● ইরান ●

মানচিত্রে দেখ, এশিয়ার মহাদেশের আফগানিস্তান ও ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত ইরান দেশ। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ন'শো বছর আগে পারসিক ও মিড নামে দুই উপজাতি ইরানে বসতি স্থাপন করে। তারা সম্ভবত আর্য জাতির শাখা ছিল। আর্যদের ইংরাজী 'এরিয়ান' নাম থেকে এই দেশের নাম ইরান হয় বলে অনেকে মনে করেন। পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাইরাস। সাইরাস মিডিয়ার অযোগ্য রাজাকে হারিয়ে মিডিয়া রাজ্য অধিকার করেন। পরে সাইরাসের বিরুদ্ধে এক বিরাট রাষ্ট্রজোট তৈরি হয়েছিল। এই রাষ্ট্রজোটে ছিল মিশর, ব্যাবিলন ও লিডিয়ার রাজারা। সাইরাস লিডিয়ার রাজাকে পরাজিত করেন। পারসিকদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি এশিয়া মাইনর ও ব্যাবিলন জয় করেন। পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশ তাঁর অধিকারে আসে। তিনি সিন্ধুদেশ থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না। প্রজাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি তিনি নজর দিতেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। চলাচলের জন্য সুন্দর সুন্দর পথ তৈরি করেন। সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ক্যাম্বিসেস মিশর জয় করেন। পরবর্তী রাজা দরায়ুসের শাসনকালে পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পায়। তিনি সিন্ধুদেশ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। ম্যারাথনের যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের কাছে হেরে যান। তিনি ছিলেন সুশাসক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জারেকসাস্ রাজা হন। তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে থার্মোপলির যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন সকলেই শক্তিশালী। তৃতীয় দরায়ুসের রাজত্বকালে গ্রীকবীর আলেকজান্ডার পারস্য জয় করেন। পারসিক রাজারা অধিকাংশই ছিলেন সুশাসক। সারা দেশকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক ভাগে একজন করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী দায়িত্বে থাকতেন। প্রথম দরায়ুসের রাজত্বকালে সারা দেশে

সাম্রাজ্যের উত্থান

একই ধরনের মুদ্রা চালু হয়। রাজারা ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সারা দেশে অনেক রাস্তাঘাট তৈরি করেন।

প্রথম দিকে প্রাচীন ইরানীরা শুধু অগ্নির উপাসক ছিলেন। পরে ভারতের আর্যদের মত প্রাচীন ইরানের লোকেরা বজ্র, অগ্নি ও জলের দেবদেবীর পুজা করত। সূর্য দেবতার নাম মিথু ও পৃথিবীর দেবতা অনৈতা ছিলেন প্রধান। এইসব দেবতার পুরোহিতদের বলা হত 'অ্যাজাই'। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইরানীদের মধ্যে এক ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম জরাথুস্ত্র। তিনি ইরানবাসীদের মধ্যে এক ঈশ্বরকে মেনে চলার নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। জরাথুস্ত্র বলতেন যে; পৃথিবীতে মানব সমাজের প্রথম যুগ থেকে পাপ ও পূণ্যের অবিরাম সংগ্রাম চলে আসছে। মঙ্গল ও আলোর দেবতা আহুর-মাজদা হচ্ছেন পূণ্যের প্রতীক। অমঙ্গল ও অন্ধকারের দেবতা হচ্ছেন অহির্মান। তিনি আহুর-মাজদার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাঁদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলত। আহুর-মাজদাই হলেন মূল সৃষ্টিকর্তা। ইরানীদের অগ্নি উপাসক বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরানীরা অগ্নির পুজো করত না। তারা আগুনকে পবিত্র মনে করত বলে আগুনকে কখনও নিভতে দিত না। জরাথুস্ত্রের মতে, আলো ছিল সত্য ও জ্ঞানের প্রতীক। আগুন, জল, বাতাস ও মাটি তাঁর মতে খুব পবিত্র। তাই জরাথুস্ত্রের ধর্মমতে বিশ্বাসী ইরানীরা মৃতদেহ জলে, মাটিতে ফেলত না। আগুনেও পোড়াত না। তারা মৃতদেহ খুব উঁচুতে রেখে দিত যাতে শকুনরা ঐ মৃতদেহ খেয়ে ফেলতে পারে। জরাথুস্ত্রের মতবাদ পরবর্তীকালে যে গ্রন্থে লিখে রাখা হয়েছিল তার নাম 'জেন্দ আবেস্তা'। এটা ছিল তাদের ধর্মগ্রন্থ। বর্তমান ইরানে অবশ্য এ ধর্ম আর নেই। এখন সেখানকার সব লোকই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীন ইরানীদের বংশধররা এখনও বাস করে। এরা পার্শী নামে পরিচিত। এরা জরাথুস্ত্রের ধর্মমতে বিশ্বাসী।

জরাথুস্ত্রের ধর্মমত

● কী শিখলে ●

● ইরানের ইতিহাসও ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। সেখানে নানা

সভ্যতার মিলন ঘটেছে।

- জরাথুস্ট্রের ধর্ম মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।
- ইরানে বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

'ঘ'

● ইহুদী জাতি ●

ইহুদী বা হিব্রুরা পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী এক প্রাচীন জাতি। আনুমানিক দেড় হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এরা ইউফ্রেটিস নদীর ধারে বাস করত। এদের ভাষা ছিল হিব্রু। এরা যাযাবরের মত জীবন কাটাত। মেষ পালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। ঐ অঞ্চলে জলাভাব ও খ্যাদাভাবের জন্য প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হত। তাই তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ দুঃখ কষ্টের হাত থেকে বাঁচার জন্য মিশরে চলে যায়। এই যাত্রায় তাদের নেতা ছিল আব্রাহাম। সেখানে তারা সুখ-শান্তিতে বাস করতে লাগল। ওল্ড টেস্টামেন্ট্ বা হিব্রু বাইবেল ছিল তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। এদের ঈশ্বরের নাম যিহোবা।

আদি বসতি

পরবর্তীকালে হিকসস্ নামে একটা জাতি মিশর আক্রমণ ও অধিকার করে। হিকসস্দের সঙ্গে ইহুদীদের ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঐ দেশে ইহুদীদের জনসংখ্যা বেড়ে যায়। আর্থিক ক্ষেত্রে তারা উন্নতি করতে থাকে। মিশরীয়রা হিকসস্দের বন্ধু ইহুদীদের সহ্য করতে পারত না। দেড়শো বছর ধরে হিকসস্রা মিশর শাসন করে। তারপর মিশরীয়রা হিকসস্দের বিতাড়িত করে স্বাধীন হয়। মিশরের ফ্যারাও ইহুদীদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। এরপর ইহুদীদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। এতে তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। কার্যত তারা মিশরীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত হল।

মিশরের বসবাস

এই দুঃখ ও যন্ত্রণার দিনে মোজেস নামে ইহুদীদের এক নেতার আবির্ভাব হল। তিনি ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের মিশর ছেড়ে চলে যাবার পথ দেখান। মোজেস ইহুদীর কাছে ঈশ্বরের দূত ছিলেন। প্রথমে মোজেস, ফ্যারাওদের কাছে ইহুদীদের মিশর ত্যাগের

অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়া গেল না। চারদিকে সতর্ক পাহারার মধ্যে পালাবারও পথ নেই। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের প্রতিরোধ, সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। ফলে ফ্যারাও শেষ পর্যন্ত তাদের মিশর ত্যাগের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাদের মিশর ত্যাগের ঠিক পরেই ফ্যারাও পেছন দিক থেকে সসৈন্যে তাদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। ক্রীতদাসের জীবন ছেড়ে ইহুদীদের মিশর ত্যাগ 'এক্সোডাস' নামে পরিচিত। ফ্যারাও-এর সৈন্যবাহিনী পৌঁছোবার আগেই তারা পূর্বদিকে লোহিত সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হয়। সামনে সমুদ্র, পেছনে মিশরের সৈন্যবাহিনী। এই বিপদে মোজেস তাদের রক্ষা করলেন। কথিত আছে, মোজেস সমুদ্রের জলে হাত দেওয়া মাত্র সমুদ্র দু'ভাগে ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে দিল। ইহুদীরা ওই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হল। মিশরের সৈন্যরা ঐ পথ দিয়ে যাবার পথে সমুদ্র আবার জুড়ে গেল। মিশরীয়সৈন্যরা সব সমুদ্রের জলে ডুবে মারা গেল। তারপর তারা সিনাই পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে মোজেস মারা যান। পরে অনেক কষ্ট করে ইহুদীরা নিজেদের দেশ প্যালেস্টাইনে ফিরে এসেছিল।

মোজেস

মোজেস ইহুদীদের একমাত্র দেবতা যিহোভার উপাসনা করতে বলেছিলেন। তিনি তাদের ঈশ্বরের দশটি উপদেশ পালন করতে বলেন। এই দশটি উপদেশ হল— (১) একমাত্র যিহোভার পুজো করবে। (২) মূর্তিপুজো করবে না। (৩) মাতা-পিতাকে ভক্তি করবে। (৪) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (৫) পরের জিনিসে লোভ করবে না। (৬) চুরি করবে না। (৭) কাউকে হত্যা করবে না। (৮) মিথ্যা সাক্ষী দেবে না। (৯) স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করবে। (১০) ঈশ্বরের নামে অকারণে শপথ করবে না।

ধর্মবাণী

প্যালেস্টাইনে ইহুদীরা একটা রাজ্য গড়ে তুলল। সলোমন ছিলেন ইহুদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকালে শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তাঁর শাসনকাল ছিল তাদের স্বর্ণযুগ। তিনি বড় কবি ছিলেন। তিনি গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতা ডেভিডও কবি ছিলেন। তাঁর সময় রাজধানী ছিল জেরুজালেম। কিন্তু সলোমনের

মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদের চারপাশে আসিরীয়, মিশর, ব্যাবিলনের মত শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তাদের আক্রমণে ইহুদীদের পতন ঘটে। স্বাধীনতা হারিয়ে তারা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ইজরায়েল ইহুদীদের রাষ্ট্র।

● কী শিখলে ●

- যোগ্য নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছা মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে পারে।
- 'দশটি উপদেশ' ইহুদিদের জীবনের চলার পথ দেখায়।

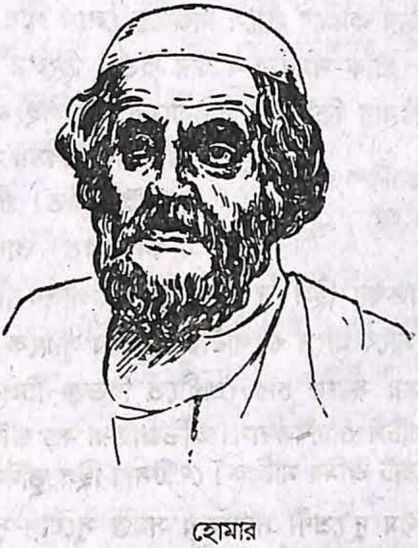
।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

● গ্রীস ●

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূলের মূল ভূখণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ নিয়ে গঠিত গ্রীস। গ্রীস ছিল প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধানকেন্দ্র ও লীলাভূমি। গ্রীস পার্বত্যময় দেশ। তাই এখানে অনেক ছোট ছোট নগর গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক কারণে সমগ্র গ্রীসে একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে সব নগরই একসময়ে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গ্রীসের আগে নাম ছিল হেলাস। পরবর্তীকালে রোমানরা এদেশের নামকরণ করে গ্রীস। গ্রীসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ক্রীট একটা বড় দ্বীপ। অতি প্রাচীনকালে সেখানে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে। এই সভ্যতা ঈজিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। সুন্দর সুন্দর দালান ও প্রাসাদ উন্নত স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দেয়। চিত্রলিপির সাহায্যে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। পরবর্তীকালে তারা রেখা-লিপি সৃষ্টি করে। ক্রীটের রাজধানী নোসস নগরে সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মন্দির, রাস্তাঘাট ছিল। শিল্প ও স্থাপত্যে তারা ছিল খুবই উন্নত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবিদ্যায় তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। এই সভ্যতা ব্যাবিলন ও মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। পরবর্তী যুগে গ্রীক সভ্যতাও ঈজিয়ান সভ্যতাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। ক্রীটের রাজাদের 'মিনস্' বলা হত। তাদের এই

ঈজিয়ান সভ্যতা

নাম অনুযায়ী ব্রোঞ্জযুগের এই সভ্যতা 'মিনয়ান সভ্যতা' নামেও পরিচিত।মাইসিনীয়দের আক্রমণে এই সভ্যতার পতন ঘটে। এই মাইসিনীরাই গ্রীসে ঈজিয়ান সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেয়।



হোমার

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর আগে প্রাচীন যুগের গাথা ও কাহিনীকে ভিত্তি করে গ্রীসের ইতিহাস রচিত হয়েছে। কারণ, কবিরা পৌরাণিক বীরদের কাহিনী নিয়ে নানা গাথা রচনা করতেন। বীরদের যুদ্ধ কাহিনী নিয়েই প্রাচীন গ্রীসে রচিত হয়েছিল দুটি গাথা-- ইলিয়াড ও ওডিসি। এ দুটিকে মহাকাব্য বলা হয়। এই মহাকাব্য দুটির রচয়িতা ছিলেন অন্ধ কবি হোমার। ট্রয় নগরীর সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ নিয়ে রচিত হয়েছিল ইলিয়াড। আর ওডিসিতে ছিল ট্রয়ের পতনের পর গ্রীক বীর ওডিয়াসের দেশ ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমাদের মহাকাব্য থেকে আমরা যেমন প্রাচীন ভারবর্ষের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পাই, তেমনি ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের ধারণা পাওয়া যায়।

ইলিয়াড ও ওডিসি

সেকালে গ্রীস অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। প্রত্যেক রাষ্ট্রে রাজাই ছিলেন সমস্ত শক্তির উৎস। তিনি ছিলেন একাধারে শাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি ও ধর্মের প্রধান। রাজ্যশাসনে রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য বাউলী ও এগোরো নামে দুটি সমিতি ছিল। প্রথমটি অভিজ্ঞ বয়স্কদের নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়টি গঠিত হত

রাজনৈতিক জীবন

জনসাধারণকে নিয়ে। ধীরে ধীরে রাজার ক্ষমতা কমতে থাকে, বাড়তে থাকে অভিজাতদের প্রতিপত্তি। পরবর্তীকালে অভিজাতদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গ্রীসে রাজতন্ত্র লোপ পায়।

গ্রীক সমাজে বাড়ির কর্তাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। সমাজ ছিল পরিবার ভিত্তিক। পরিবারের সকলেই গৃহকর্তার নির্দেশ মেনে চলত।

সামাজিক জীবন ও ধর্ম

মেয়েরাও অবসর সময়ে সুতো কাটত, তাঁত বুনত, সেলাই করত। গ্রীকরা খুব সহজ সরল জীবন যাপন করত। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর ছিল না। কৃষি ও পশুপালন ছিল তাদের উপজীবিকা। খাদ্য হিসাবে মাংস ও পানীয় হিসেবে সুরাকে তারা খুবই পছন্দ করত। সেই সময় সমাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল--অভিজাত, সাধারণ নাগরিক, থেটিস ও ক্রীতদাস। অভিজাতরা বড় জমির মালিক। সাধারণ মানুষ ছিল ছোট জমির মালিক। থেটিসরা ছিল ভূমিদাস এবং যুদ্ধবন্দীরা ক্রীতদাস। প্রথম দু'শ্রেণী সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সে যুগের গ্রীকরা বহু দেব-দেবীর পুজা করত। তারা বিশ্বাস করত যে, দেব-দেবীরা থাকেন ওলিম্পাস পর্বতে। দেব-দেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জিউস, এ্যাপোলো, এথেনা। ওলিম্পিয়াতে জিউসের সম্মানে যে খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হতো তাই-ই পরবতীকালে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার নামে পরিচিত হয়। প্রতি চার বছর অন্তর ঐ খেলাধূলার আয়োজন হোত। প্রতিটি নগর রাষ্ট্র থেকে সেখানে অংশগ্রহণ করত। আজ থেকে প্রায় ৭৭৬ খৃঃ পূঃ অর্থাৎ আঠাশ'শ বছর আগে এই খেলা প্রথম শুরু হয়। কুস্তি, দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ, লম্ফন, ঘোড়ার গাড়ী চালনা প্রভৃতি নানা ধরনের খেলাধূলা সেখানে হোত। এর মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব জেগে উঠত। ঐ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ, ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ ছিল। আজও ঐ কারণে প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক খেলার আসর বসে।

আগেই বলা হয়েছে, গ্রীস ছিল পাহাড়-পর্বতে ভরা। পূর্বে ঈজিয়ান সাগর, পশ্চিমে আয়োনিয়ান সাগর, আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। প্রাকৃতিক অবস্থাই গ্রীসে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে বাধা। পাহাড়ের মধ্যবতী উপত্যকায়

গড়ে উঠেছিল অনেক নগর রাষ্ট্র। এদের মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এথেন্স, স্পার্টা, থীবস্ ও ম্যাসিডন। গ্রীকরা সমুদ্রপথে পাড়ি দিত এই যোগাযোগের ফলে গ্রীসের নগরগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটত।

নগর ও রাষ্ট্র

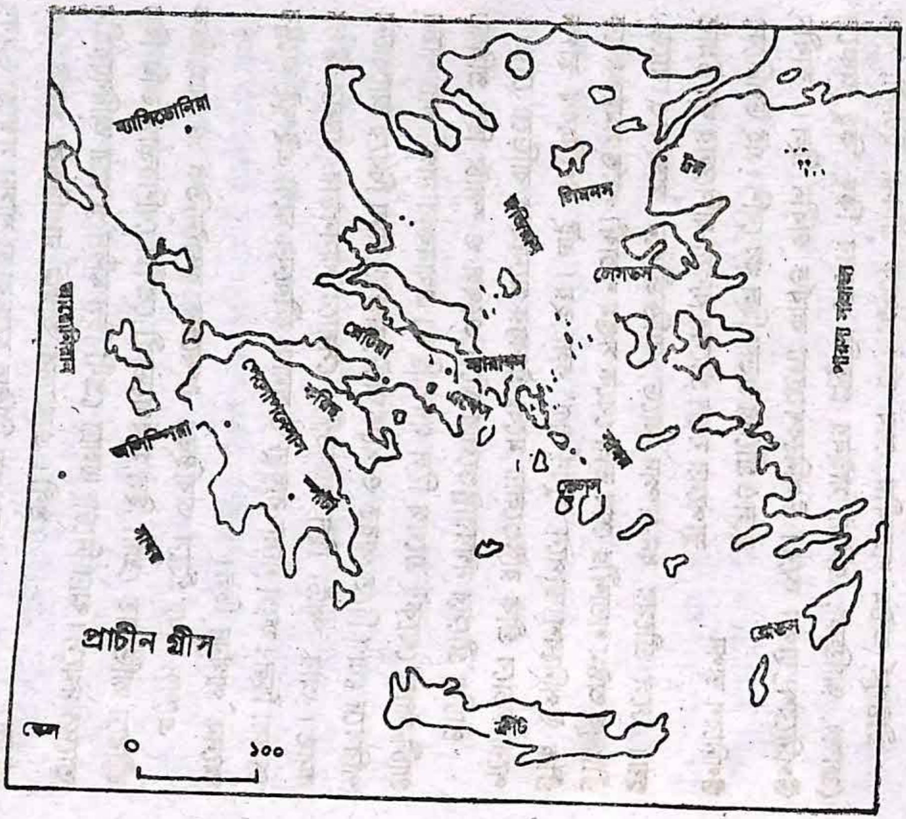
খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে গ্রীকরা ইটালী, গল (ফ্রান্স), আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। উপনিবেশগুলো কার্যত স্বাধীন ছিল। স্বাধীন হলেও গ্রীসের প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই উপনিবেশ স্থাপনের ফলে গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। ফলে গ্রীসের ধন-সম্পদ বাড়ে, ব্যক্তিজীবনে স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনে 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয়। এই উপনিবেশ স্থাপন পরোক্ষভাবে গ্রীক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্যের মনোভাব বাড়িয়ে দেয়।

উপনিবেশ স্থাপন

প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা ছিল প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকাল থেকেই এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক। এখানকার নাগরিকরা শাসন পরিষদে যোগ দিতে পারত ও পথে ঘাটে, বাজারে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। আর স্পার্টা ছিল রাজতন্ত্রী। সেখানে শাসনভার রাজার উপর দেওয়া ছিল। ফলে শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ জীবনের মধ্যে এই দুই রাষ্ট্রের অনেক পার্থক্য ছিল।

এথেন্স মধ্য গ্রীসে অবস্থিত। এথেন্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অভিজাত শ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। বেশিরভাগ জমি ছিল তাদের দখলে। আর নিচের তলার শ্রেণী ছিল দরিদ্র ও প্রায় অধিকারহীন শ্রেণী। এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকরা সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়ে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাদের মতামত জানাতেন। জনসংখ্যা খুব কম থাকায় এটা সম্ভব হত। এথেন্সের সব অধিবাসীরাই স্বাধীন নাগরিক ছিলেন না। নাগরিকের অধিকার ভোগ করতেন সামান্য সংখ্যক লোকই। কার্যত অভিজাত শ্রেণীই দেশের শাসন চালাতেন। পরে অর্থের ভিত্তিতে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠায় বংশগৌরব মর্যাদা লোপ পায়। সোলন নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শাসনের সংস্কার

এথেন্স


ম্যাসিডোনিয়া
প্রাচীন গ্রীস
ক্রীট
০
১০০

করে এথেন্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুত করেন। ফলে কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও গরীব কারিগরদের সুবিধা হয়। সে সময় জনসাধারণ সামাজিক দিক থেকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— অভিজাত, কৃষক ও বণিক। এথেন্সের ওপরতলার মানুষরা বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাতেন। সমস্ত কাজকর্ম প্রায় ক্রীতদাসদের দিয়ে করানো হোত। এথেন্সে শিশুদের শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষকরা বেতনের বিনিময়ে ছাত্রদের পড়াতেন। সাধারণত তারা চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। সেখানে তারা ইতিহাস, গানবাজনা, ছবি আঁকা, ব্যায়াম ইত্যাদি শিক্ষা করত। বড় হয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিত। মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ ছিল। তারা সংসারের কাজ ছাড়াও সুতো কাটা, কাপড় বোনা, গানবাজনা, পড়াশোনা ঘরে বসে শিখত। জমিতে মজুরের কাজ করত দাসেরা। দাসেরা সমস্ত অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল। কার্যত রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন **আর্কণ** নামে ন'জন লোক।

স্পার্টা

স্পার্টা দক্ষিণ গ্রীসে অবস্থিত ছিল। স্পার্টার চারদিকে ছিল পাহাড় ও শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী। তাই স্পার্টাকে বরাবর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার দিকে লক্ষ্য দিতে হয়েছে। **লাইকারগাস** নামে একজন আইনজ্ঞ এক ধরনের কঠোর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাই স্পার্টার লোকেরা শরীর চর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় তাদের সমস্ত সময় ও শক্তি দিত। সাত বছরের পর থেকেই রাষ্ট্র শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নিত। তাদের ছাত্রজীবন ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। ত্রিশ বছর বয়সে তারা পারিবারিক জীবন যাপন করত। স্পার্টার মেয়েদেরও ছেলেদের মত শরীর চর্চা করতে হতো। স্পার্টার অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—স্পার্টান, পেরিওসি ও হেলট। স্পার্টানরা রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করত। পেরিওসিরা ছিল স্পার্টার আদি আধিবাসী। শাসনকার্য ছাড়া বাকি সব অধিকারই তাদের ছিল। হেলটরা ছিল অত্যাচরিত, অধিকারহীন ও ভূমিহীন শ্রমজীবী মানুষ। তারাই ছিল স্পার্টার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তারাই জমিজমা চাষ করত। স্পার্টানরা তাদের হত্যাও করতে পারত। ফলে হেলটরা মাঝেমাঝে বিদ্রোহও করত। স্পার্টায় এক অদ্ভুত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ছিল। একসঙ্গে দুজন রাজা সমান ক্ষমতা নিয়ে রাজত্ব করতেন। তারাই ছিলেন যুদ্ধ, বিচার ও ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রধান! কেন এই দুজন রাজা থাকত তা তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। আসলে স্পার্টার লোকেদের প্রায়ই যুদ্ধ করতে হত। তখন একজন রাজা যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, আর অপর রাজা শাসনকার্য চালাতেন। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্যের জন্য অভিজাতদের সেনেট, সাধারণ লোকেদের এ্যাসেম্বলী ও 'এফোরেট' গঠিত হত। ফলে স্পার্টায় অভিজাত, সাধারণ মানুষের শাসনকাজে ভূমিকাও ছিল। গ্রীসে স্পার্টানদের মত বীর যোদ্ধা আর কোথায়ও ছিল না।

পারস্য দেশের রাজা দরায়ুস ও জারেক্সাসের আক্রমণের সময় গ্রীকরা স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করেছিল। পারস্য আক্রমণ প্রতিহত হবার পর তাদের পারস্যভীতি দূর হল। এরপর শুরু হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ছিল খুব বিরোধ। স্পার্টার স্থলবাহিনী ছিল অপরাজেয়। আর এথেন্সের নৌ-বাহিনী ছিল খুব শক্তিশালী। এক সময়ে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। প্রায় সাতাশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধকে (খ্রীঃ পূঃ ৪৩১-৪০৪) পেলোপনেসীয় যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধে গ্রীসের প্রায় প্রতিটি রাজ্য কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়েছিল। অবশেষে এথেন্স পরাজিত হয় ও স্পার্টা ও তার বন্ধুরাষ্ট্রগুলি জয়ী হয়। এথেন্স শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এই পরাজয়ের পর এথেন্সের পতন শুরু হল। গ্রীস দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ম্যাসিডন সমস্ত গ্রীসে তার প্রভাব বিস্তার করে। থিবস্ নগর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭১) স্পার্টার পরাজয়ে স্পার্টার গৌরবের দিন শেষ হয়ে যায়।

এথেন্স ও স্পার্টার বিরোধ

গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে এথেন্স গৌরবের শিখরে উঠেছিল। পেরিক্লিসের সময়ে এথেন্সের এক বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। তাঁর আমলে এথেন্সের সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

পেরিক্লিসের যুগ

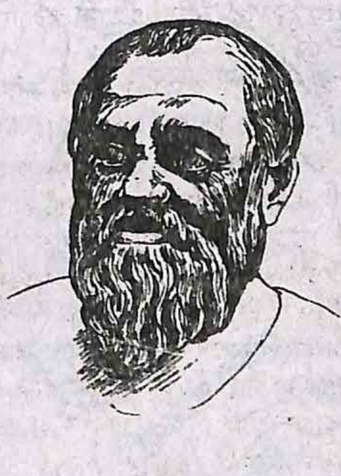
এই যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস। নাটক রচনায়, সঙ্গীতে ও নৃত্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এথেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করে। এছাড়াও, নাট্যকার ইস্কাইলাস, আরিস্টোফেনিস ও ইউরিপিডিসের এই যুগে আবির্ভাব ঘটেছিল। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ও ঐতিহাসিক থুকিডিডিস ছিলেন এথেন্সের গৌরব। থুকিডিডিসিসের বিবরণ থেকে আমরা পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারি।

নাটক, ইতিহাস ও সঙ্গীত

এই যুগেই জন্মেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক **সক্রেটিস**। তিনি 'বিশ্বাসের বদলে যুক্তি' দিয়ে সব কিছু বিচারের কথা বললেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতার জন্য বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। বিষ খেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহান দার্শনিক **প্লেটো** ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। প্রখ্যাত দার্শনিক **এ্যারিস্টটল** ছিলেন আবার প্লেটোর শিষ্য। বিখ্যাত ভাস্কর **ফিডিয়াস** ও প্রাকসিটিলিস এবং স্থপতি ইকটিনাস ছিলেন এথেন্সের গৌরব। বিখ্যাত বাগ্মী ডেমস্থিনিস এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল দেবী এথেনার মন্দির 'পার্থেনন্' ও এথেনার ব্রোঞ্জমূর্তি।

সক্রেটিস

শিল্পকলা



সক্রেটিস

গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডনিয়া নামে একটা ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ম্যাসিডন। ম্যাসিডনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, উভয় রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগে এথেন্স ও স্পার্টা অধিকার করেন। তিনি গ্রীসের শত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করেন। পরে

ম্যাসিডিনিয়া

পারস্য সাম্রাজ্য ও আলেকজান্ডার



তিনি পারস্য আক্রমণে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধের আগেই তিনি নিহত হন। ফিলিপের মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার রাজা হন। তিনি এ্যারিস্টটলের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পশ্চিম এশিয়ার বহু রাজ্য জয় করেন। মিশর তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। তিনি সেখানে আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি শহরের পত্তন করেন। পারস্য সম্রাটকে তিনি আরবেলার যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান

এরপর আলেকজাণ্ডার আফগানিস্তান জয় করে ৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। তক্ষশীলার রাজা অম্ভিও তাঁর অধীনতা মেনে নেন। কিন্তু পাঞ্জাবের এক ছোট রাজ্যের রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করেন। হিদাস্পিসের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হয়েও বশ্যতা স্বীকারে রাজী হননি। আলেকজাণ্ডার তাঁকে মুক্তি দেন ও তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এর পর আলেকজাণ্ডার মগধ জয়ের উদ্দেশ্যে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। মগধ ছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আলেকজাণ্ডারের ক্লান্ত সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে রাজী হল না। ফলে তিনি বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। ফেরার পথে ব্যাবিলনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)।

সাম্রাজের পতন

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সুযোগে রোমানরা ম্যাসিডনিয়া সহ সমগ্র গ্রীস অধিকার করে নেয়। সমস্ত গ্রীস রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এদিকে গ্রীক সভ্যতা রোমান সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। পরে এই দুই সভ্যতার মিলনে রোমান সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতায় এক নতুন গতির সৃষ্টি করে।

● কী শিখলে ●

- প্রাকৃতিক বাধা গ্রীকদের মধ্যে রাষ্ট্র গড়তে সাহায্য করেনি।
- নানা সভ্যতার দানে গ্রীক সভ্যতা পরিপুষ্ট।
- এথেন্সের জনগণতন্ত্র ও স্পার্টার রাজতন্ত্রের সংঘাত।
- এথেন্সের সমৃদ্ধি--পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ--কাব্য, নাটক, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য--অলিম্পিক খেলা। নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত দার্শনিক, পণ্ডিতদের আবির্ভাব; পৃথিবীর সভ্যতা সমৃদ্ধ।
- ক্রীতদাস ব্যবস্থা সভ্যতার বনিয়াদ ও নানা অসন্তোষ - মানব সম্পদের অপব্যবহার।
- আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়--ফলাফল - পতন।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

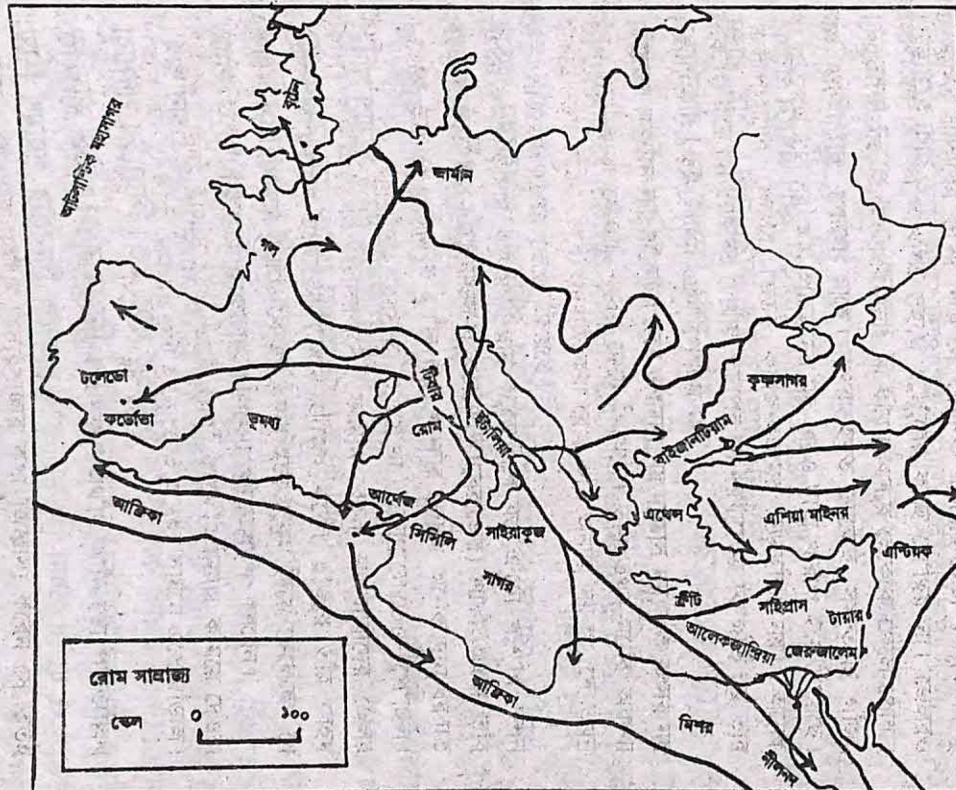
● রোম ●

রোমের ভৌগোলিক অবস্থান

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দে রোম নগরের পত্তন হয়। এর প্রাচীনতম ইতিহাস সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাচীন উপাখ্যানে আছে যে, যুদ্ধ দেবতা মার্সের পুত্র রোমুলাসের নামে এই নগরীর নাম হয় রোম। ইউরোপের দক্ষিণাংশে ইতালীর কেন্দ্রস্থলে রোম নগরী অবস্থিত। রোম নগরীর চারপাশে ছিল পর্বতমালা। পাশ দিয়ে বয়ে যেত টাইবার নদী। রোম পর্বতে ঘেরা হলেও চারপাশে ছিল বিশাল উর্ব্বর প্রান্তর।

আদি ও প্রস্তর যুগে ইতালী

ইউরোপের প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে গ্রীস ও রোম শিক্ষা-দীক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। গ্রীস গণতন্ত্রের জন্মভূমি হিসেবে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়ে ইতিহাসে স্থান লাভ করেছিল। ইউরোপের বহুবিভক্ত রাষ্ট্রগুলোকে একই শাসনে ঐক্যবদ্ধ করে রোম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। অতি প্রাচীনকালের যেসব



আটলান্টিক মহাসাগর
বৃটেন
জার্মান
গল
টলেডো
কর্ডোভা
ভূমধ্য
টাইবার
রোম
ইটালিয়া
কৃষ্ণসাগর
বাইজান্টিয়াম
এথেন্স
এশিয়া মাইনর
এন্টিয়ক
আর্থেজ
সিসিলি
সাইরাকুজ
সাগর
ক্রীট
সাইপ্রাস
টায়ার
আলেকজান্দ্রিয়া
জেরুজালেম
আফ্রিকা
আফ্রিকা
মিশর
নীলনদ
রোম সাম্রাজ্য
স্কেল ০ ১০০

ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, ইটালীতে আদি ও নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ বাস করত। প্রাচীনকালে ইতালীতে অনেকগুলো জাতি বাস করত। কৃষি ও পশুপালন ছিলো তাদের প্রধান পেশা। একে একে সকলেই রোমের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রাচীন উপাখ্যানে আছে যে, রোমে রাজারা দেশ শাসন করতেন।

রাজতন্ত্রের বিলোপ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

একে বলা হয় রাজতন্ত্র। সম্ভবত, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এখানে রাজতন্ত্র ছিল। এখানে পরপর সাতজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। শেষ রাজা তারকুইনের অত্যাচারের প্রতিবাদে রোমে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে বিতাড়িত তারকুইন আবার রোমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি।

প্রাচীন রোমান সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তার নির্দেশে সবাইকে চলতে হত। সে যুগে রোমানরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত

রাজতন্ত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

ছিল--প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্যাট্রিসিয়ানরাই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। অন্য অঞ্চল থেকে যারা রোমে এসে বসবাস করেছিল তারা ছিল প্লেবিয়ান। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও এরা নিম্নশ্রেণী হিসেবে পরিচিত ছিল। রাজা, রাজমনোনীত সমিতি (সিনেট) ও জনসাধারণ নিয়ে গঠিত পরিষদ ছিল প্রাচীন শাসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। রাজাদের অভিজাত বংশ থেকে নির্বাচিত হতে হত। সিনেটের সদস্যরা তাঁকে নির্বাচন করতেন। শাসনের শীর্ষে ছিলেন রাজা। তিনি সামরিক বিভাগ ও ধর্মের প্রধান ছিলেন। তবে রাজাকে সিনেটের পরামর্শ নিয়ে চলতে হত।

রাজতন্ত্র অবসানের পর দেড়শো বছর ধরে রোমানদের বিভিন্ন

সমগ্র ইতালীতে রোমের প্রভুত্ব

প্রতিবেশী উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। চারদিকে শত্রুর আক্রমণে তারা হতাশ হয়ে পড়েনি। শেষ পর্যন্ত তারা সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করে উত্তর ইতালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপন করে। মধ্য ইতালীর আধিপত্য

নিয়ে অনেকদিন ধরে রোমের সঙ্গে 'সামনাইট' দের অনেকদিন লড়াই করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রোমানরা জয়ী হয়ে মধ্য ইতালীতে রোমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তারা দক্ষিণ ইতালীতে আধিপত্য স্থাপন করে সমগ্র ইতালীতে রোমের প্রভুত্ব স্থাপন মজবুত করে।

খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ টায়ার নগরের ফিনিসীয় অধিবাসীরা আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে কার্থেজ নগরী স্থাপন করে। কালক্রমে বীর হামিলকার বার্কার নেতৃত্বে কার্থেজ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে কার্থেজ সাম্রাজ্য সার্ডিনিয়া, কর্সিকা ও সিসিলি দ্বীপে বিস্তার লাভ করে। ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমভাগে যে সব ছোট ছোট দ্বীপ ছিল তারাও কালক্রমে কার্থেজের বশ্যতা স্বীকার করে। এইভাবে কার্থেজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। অবশেষে সিসিলির আধিপত্য নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই দুই দেশের মধ্যে পিউনিকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ হয়। পিউনিকের প্রথম যুদ্ধে রোম সিসিলির অধিকাংশ অধিকার লাভ করে। তারপর কার্থেজের বিখ্যাত বীর হ্যানিবল ইতালী আক্রমণ করেন ও বহু শহর দখল করেন। কিন্তু হ্যানিবলের নেতৃত্বে কার্থেজ পিউনিকের দ্বিতীয় যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। পঞ্চাশ বছর পরে পিউনিকের তৃতীয় যুদ্ধেও কার্থেজ পরাজিত হল। বিজয়ী রোমানরা কার্থেজ অধিকার করে ও এই শহরকে পুড়িয়ে দেয় এবং অধিবাসীদের দাস হিসাবে বিক্রি করে।

রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ

রোমান সাম্রাজ্যে রোমের লোকসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল ক্রীতদাস। যুদ্ধবন্দীদেরও ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। পরিশ্রমসাধ্য সব কাজই করত ক্রীতদাসেরা। তাদের ওপর হত ভীষণ অত্যাচার। কার্যত তারা বন্দীদের মতই জীবন কাটাত। যাতে ক্রীতদাসরা পালাতে না পারে তার জন্য শেকল দিয়ে কোমরের সঙ্গে দুপা বেঁধে রাখা হোত। তাদের দিয়ে ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুদের লড়াই করানো হত। একজন নিহত হলে লড়াই বন্ধ হত। আর এই নিষ্ঠুর লড়াই দেখে আনন্দ পেত অভিজাত রোমানরা। এই দাসযোদ্ধাদের বলা হত

ক্রীতদাস ও বিদ্রোহ

'গ্ল্যাডিয়েটর'। এই নিষ্ঠুর দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ক্রীতদাসরা সিসিলেতে দু'বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। এর পর একবার **স্পার্টাকাস** নামে এক ক্রীতদাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ হয়। তিন বছর ধরে বিদ্রোহ চলার পর রোমানরা স্পার্টাকাসকে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্পার্টাকাস নিহত হবার পর এই বিদ্রোহ থেমে যায়। তাঁর সমর্থকদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। অত্যাচারিতের এই বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যের শাসক শক্তিকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব স্থাপনের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে প্রজাতান্ত্রিক শাসনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। অভিজাত শ্রেণীর শোষনের ফলে দলে দলে দরিদ্র কৃষক ও মজুরেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে রোজগারের আশায় চলে যেতে লাগল। গ্রামের জনস্যখ্যা কমতে লাগল। বাড়তে লাগল শহরের জনসংখ্যা । এই সংকট গ্রামের অর্থনীতিকে আঘাত করল। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতার ফলে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা অনেক সময়ে কেন্দ্রের নির্দেশ মানত না। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সে সময় দলীয় স্বার্থের লড়াই জাতীয় ঐক্যকে নষ্ট করতে শুরু করল। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিল। ফলে রোমের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে গভীর সংকট দেখা দিল। এই সংকট সমাধানে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যর্থ হতে লাগল।

সাধারণতন্ত্র পতনের প্রাককালে রোমের অবস্থা

এই সংকটের ফলে দেশের বড় বড় যোদ্ধারা সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে থাকে। প্রথমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ম্যারিয়াস নামে এক সেনাপতি। তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন সুল্লাই নামে আর এক সেনাপতি। এর কিছুকাল পরে পোম্পে, ক্র্যাসাস ও জুলিয়াস সীজার নামে তিন সেনাপতি একত্রে রোমের ক্ষমতা দখল করেন। এইভাবে সাধারণতন্ত্রের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে সীজার সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি ছিলেন রণনিপুণ সেনাপতি,

জুলিয়াস সীজার

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

সুবক্তা ও পণ্ডিত। তিনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্রিটেনের এক বিরাট অংশ অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাতান্ত্রিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ছিলেন একনায়ক। সৈন্যবাহিনীর সাহয্যে তিনি তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। প্রকৃতপক্ষে সেনেট তাঁর আজ্ঞাবহ সংস্থায় পরিণত হয়। তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরোধীরা তাঁকে হত্যা করে। তার কিছুকাল পরে বিবোধীদের দমন করে সীজারের পালিত ছেলে অক্টোভিয়াস রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। সেনেট বাধ্য হয়ে তাকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। **অক্টোভিয়াস অগাস্টাস** উপাধি গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রের পতন সম্পূর্ণ হয়। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি ৪৪ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন।

সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পতন

অগাস্টাস সীজারের শাসনকালে শিল্পে ও সাহিত্যে রোমের খুব উন্নতি হয়েছিল। তাঁর শাসনকালকে রোমের গৌরবময়যুগ বলা হয়। তাঁর সু-শাসনে রোম ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। অগাস্টাসের মৃত্যুর পরে যাঁরা রোম শাসন করেছিলেন তাঁরা কেউ ছিলেন অত্যাচারী, আবার কেউ ছিলেন দার্শনিক বা শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী। কিন্তু এঁদের শাসনকালেই রোম সাম্যাজ্য গৌরবের চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। স্থাপত্য কীর্তির জন্যে সম্রাট ভেসপেসিয়ানের রাজত্বকাল প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত 'কলোসিয়াম' প্রেক্ষাগৃহে নব্বুই হাজার দর্শক বসতে পারত। এই রাজতন্ত্রের যুগে বড় বড় সুন্দর শহর গড়ে উঠেছিল। শহরগুলোতে সুন্দর সুন্দর রাস্তা, মন্দির, প্রাসাদ, থিয়েটার, সাধারণ স্নানাগার প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল। এই যুগের বড় অবদান হল রোমের আইন । এই আইন ইউরোপের সমস্ত দেশের আইনের ভিত্তি রচনা করেছিল। এই যুগে ল্যাটিন সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল। কবি ভার্জিল, ঐতিহাসিক লিভি ও ট্যাসিটাস ছিলেন রোমের গৌরব। রোমানদের তৈরি বিরাট বাড়ীঘর, খিলান ও গম্বুজ পৃথিবীখ্যাত। তাঁদের রচিত

* সম্রাট জুলিয়াস সীজারের নাম অনুসারে ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের সপ্তম মাসের নাম হয় জুলাই এবং অগাস্টাসের নাম অনুসারে অষ্টম মাসের নাম হয় অগাষ্ট।

পঞ্জিকা বহু দেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই গৌরবের দিন একশো বছরের বেশী টেকেনি। তারপর অযোগ্য শাসকদের শাসনে শুরু হল আবার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা প্রায় একশো বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্টোগথদের আক্রমণে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন হলেও --পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বহুদিন টিকে ছিল।

খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান

রোমান সম্রাট অগাষ্টাসের শাসনকালে যীশুখ্রীষ্ট রোমে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। সম্রাট টিবেরাসের রাজত্বকালে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা রোমে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারে অগ্রনী হয়। খ্রীষ্টানরা মনে করে ঈশ্বর এক। রোমানরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রেমের বানীতে আকৃষ্ট হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। পরবর্তীকালে রোমের সম্রাটেরা খ্রীষ্টানদের প্রতি শত্রু মনোভাব গ্রহণ করে। শত্রুতা যত বাড়তে থাকে, ততই বেশী সংখ্যক লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। শত অত্যাচারেও খ্রীষ্টধর্ম ধ্বংস করা গেল না। ধর্মের জন্যে অনেক খ্রীষ্টান মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীকালে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন নিজে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর থেকেই বিনা বাধায় রোমে খ্রীষ্টান ধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর আমলেই খ্রীষ্ট ধর্ম রোম সাম্রাজ্যে রাজধর্মের মর্যাদা পেল। কালক্রমে এই ধর্ম পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধর্মে পরিণত হয়।

● কী শিখলে ●

- রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসনের (সীজার) বিরোধ।
- পাশাপাশি দুটি বড় সাম্রাজ্য--রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয়।
- ক্রীতদাস ব্যবস্থা—মানব সম্পদের অপব্যবহার ও শোষন, বিদ্রোহ (স্পার্টাকাস), গ্লাডিয়েটর, ইত্যাদি।
- রোম সভ্যতার অবদান—রোমের আইন, সাধারণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, নতুন

ইমারত গঠনরীতি, কলোসিয়াম, পঞ্জিকা, সাহিত্য, ইতিহাস, ইউরোপ-এশিয়া ও আফ্রিকায় একই আইন, একই সভ্যতার বাঁধন।

- সম্রাট কর্তৃক খ্রীষ্ট ধর্মের স্বীকৃতি ও প্রসার।
- উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েরোম সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ও পতন।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

● চীন ●

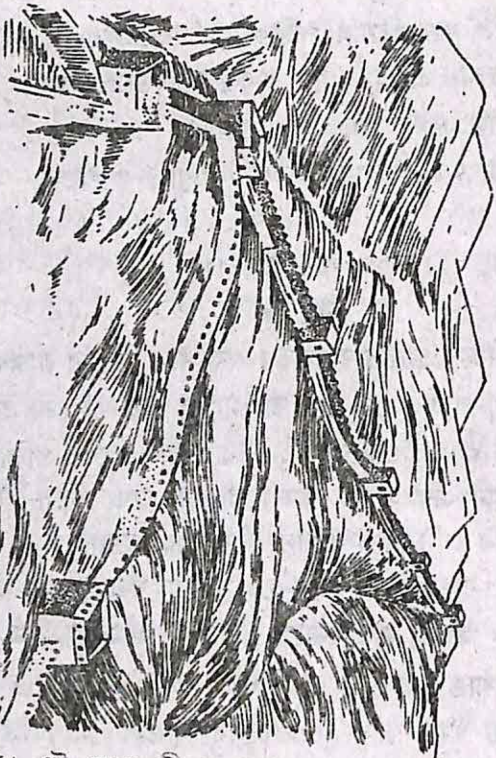
পাঁচজন পৌরানিক সম্রাটের রাজত্বের পর শাঙ বংশের রাজত্বকাল থেকে চীনের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দেড় হাজার অব্দে এই বংশ চীনে রাজত্ব শুরু করেছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন টি-আঙ। তিনি এক নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে-ছিলেন। লোকেদের মধ্যে তিনি জমি বিলি করেন। বিনিময়ে যুদ্ধের সময় তারা রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। এই ব্যবস্থা 'সামন্ত প্রথা' নামে পরিচিত। সামন্তরা নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করত। শাঙ রাজাদের রাজধানী বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। মাটি খুঁড়ে তার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এইসব ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এদের রাজধানী ছিল বর্তমান চীনের হুনান প্রদেশে। মাটির নিচ থেকে ব্রোঞ্জের তৈরী অনেক জিনিসপত্র, বাঁশের ওপর লেখা গ্রন্থ, কচ্ছপের খোলায় নানা ছবি পাওয়া গেছে। এরা জলসেচের ব্যবস্থা জানত। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজে গরীব ও বড়লোক--দুইই ছিল। চীনারা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করত। শাঙ বংশের রাজারা প্রায় ছ'শো বছর রাজত্ব করার পর **চৌ বংশ** ক্ষমতা দখল করে।

শাঙ বংশ

চৌ বংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। এই বংশের রাজত্বকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়। দেশ বিদেশে চীনবাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে যেত। এই বংশের রাজত্বকালে বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস ও লাওসের জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শি-হুয়াং-তি। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কীর্তি হল 'চীনের মহা প্রাচীর'। হুণ

চৌ বংশ

আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এই প্রাচীর তৈরী করা হয়েছিল। এই প্রাচীর প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ। এই প্রাচীরের উচ্চতা ২৪ ফুট। এর ওপর দিয়ে ছ'জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারত। আজও এই প্রাচীর রয়েছে। শি-হুয়াং-তি মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার অনেক জায়গা অধিকার করেন। শাসনকার্যের সুবিধের জন্যে তিনি সমগ্র রাজ্যকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। এই সময় চীনে জলসেচ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। কিন্তু কনফুসিয়াসের শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তারা বিদ্রোহ করলে তিনি তা নির্মমভাবে দমন করেন। শি-হুয়াং-তি'র মৃত্যুর পর চৌ বংশের পতন ঘটে। হান বংশ চীনের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে।



চীনের মহাপ্রাচীর

চৌ বংশের রাজত্বকালে যে সব পন্ডিত, দার্শনিক, ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কনফুসিয়াস। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে চীনের শানটুং



কনফুসিয়াস

প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। শৈশবে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর জ্ঞানের আকাঙ্খা ছিল অপরিসীম। অনেক কষ্ট করে তাঁকে জ্ঞান অর্জন করতে হত। বাড়ীতে একটা বিদ্যালয় খুলে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তিনি মুখে মুখে ছাত্রদের ইতিহাস, কাব্য ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত ও নীতিবোধের ওপর কয়েকটা বই লেখেন। এই বইগুলো চীনা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। চৌ বংশের এক রাজার অত্যাচারে চীনের প্রজারা খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত। কনফুসিয়াস তাদের বললেন যে, নৈতিক অধঃপতনই চীনের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। তিনি আরও বললেন যে, সংসার ত্যাগ করে ধর্মকর্ম করার কোন দরকার নেই। সংসারে থেকেই মানুষের কল্যাণ করতে হবে। সৎভাবে জীবন যাপন করে সংসারের ও সমাজের উন্নতি করাই প্রকৃত ধর্ম। গুরুজনদের ভক্তি করা, পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া, সত্যকথা, সকলের সঙ্গে ভদ্র আচরণ অবশ্য পালনীয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেননি। কোন পথে মানুষ সুখী হতে পারবে--এই শিক্ষাই তিনি সারাজীবন ধরে দিয়েছিলেন। কনফুসিয়াসের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কনফুসিয়াস

● কী শিখলে ●

- চীন সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।
- সামন্তপ্রথা, চীনের প্রাচীর।
- কনফুসিয়াসের বাণী ও তার তাৎপর্য।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

● প্রাচীন ভারত ●

ভারতে যে বৈদিক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, আর্যদের নাম তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত আছে। অনুমান করা হয়, খৃষ্ট জন্মের ২০০০ কি ১৫০০ বছর আগে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আর্যরা প্রথম বসতি

স্থাপন করেন।

আর্য একটি ভাষা। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, পারসিক ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাগুলো মনে হয় কোন একটি মূল ইয়োরোপের ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছিল। এই ভাষায় যারা কথা বলতেন তারাই আর্য নামে পরিচিত। সুতরাং আর্য কোন জাতি নয়।

আর্যদের পরিচয়

আর্য কারা? এদের আদি বাসস্থান কোথায়? এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কের শেষ নেই। বহু পশ্চিমী ইতিহাস-বিদদের মতে, ভারতের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে যে আর্যরা তাঁরা এদেশীয় নয়, বহিরাগত। তারা ইউরোপের কোন অঞ্চল, বিশেষ করে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে এদেশে এসেছে। তাদের কথাবার্তা, চেহারা ইত্যাদিই এর প্রমাণ। আমাদের দেশের অনেকে বলেন, রামায়ণ, মহাভারত বা বেদের মত গ্রন্থ তো এদেশেই রচিত হয়েছে এবং আর্যরা রচনা করেছে। সুতরাং এরা ভারতীয়। অবশ্য আজকাল অধিকাংশ ইতিহাসবিদই স্বীকার করেছেন যে, আর্যরা বিদেশী এবং এদের একটি শাখা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সম্ভবত আর্যরা সিন্ধু, পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীদের পরাস্ত করে এদের দাস হিসাবে কাজে লাগায় এবং গাঙ্গেয় সমতল ভূমি অঞ্চলে এক নতুন বসতির সূচনা করে।

আর্যরা কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতা সঙ্গে নিয়ে আসেননি, কারণ ভারতে প্রবেশের আগে তারা ছিলেন যাযাবর। এদেশে এসে তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। তাই এখানকার মানুষের সাহায্যে যে সংস্কৃতি তারা গড়ে তোলেন তা একেবারেই ভারতীয় সংস্কৃতি।

বেদ

বেদ আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারিটি বেদ রচিত হয় আনুমানিক ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। বেদ আর্যদের মহান সৃষ্টি। আর্যরা লিখতে জানতেন না,তাই বেদ গুরুশিষ্য পরম্পরায় শুনে শুনে মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধরে রাখা হোত। তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদগুলির মধ্যে ঋক্‌বেদ প্রাচীনতম। এতে প্রায় ১০,০০০ শ্লোক আছে। এই বেদ থেকে প্রাচীন ভারতের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, অর্থব্যবস্থা

ইত্যাদি বহু তথ্য পাওয়া যায়। গানের স্বরলিপি নিয়ে তৈরী সামবেদ। যজ্ঞ প্রক্রিয়া নিয়ে যজুর্বেদ এবং সৃষ্টির রহস্য, নানান যাদুবিদ্যা নিয়ে অথর্ববেদ। বেদের পদ্যাংশ—সংহিতা। গদ্যাংশ—ব্রাহ্মণ। এছাড়া আছে **উপনিষদ আরণ্যক বেদাঙ্গ বেদান্ত**।

জাতিভেদ প্রথা

আর্যরা যখন ভারতে আসেন তখন, তাঁদের মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না। সমস্ত সমাজ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষ এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিল। আর এ ভাগটা ছিল কাজ অনুযায়ী। তবে পরাজিত দাসদের সঙ্গে একটা তফাৎ সব সময়ই তারা করে চলতেন। সেটা ছিল ভাষা এবং রঙের তফাৎ। তাই বলা হত বর্ণভেদ। এই পরাজিত দাসরাই ক্রমে অনার্য নামে পরিচিত হল। পরে ইতিহাসের গতিপথে আর্য অনার্য মিলেমিশে গেল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথাটা অন্যভাবে আমাদের সমাজকে অনেক ভাগে ভাগ করে দিল।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন

সমাজ ছিল পুরুষপ্রধান। গ্রামকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী ভেঙ্গে তৈরী হল রাজ্য। রাজ্য ও দলের রক্ষা ও শান্তির জন্য নির্বাচিত হলেন রাজা। রাজাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন ব্রাহ্মণ, বাহুবলে সাহায্য করতেন ক্ষত্রিয়রা এবং গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী **'সভা'** এবং **সমিতি** শাসন কার্যে সহায়তা করতেন।

পরিবার ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা গৃহপতি। কয়েকটি পরিবার নিয়ে তৈরী হত একটি গ্রাম। গ্রামের শাসনকর্তাকে বলা হত গ্রামনী। কয়েকটি গ্রাম মিলে তৈরী হত বিশ বা জন অর্থাৎ জনপদ। তার কর্তাকে বলা হত বিশপতি বা রাজন। এছাড়া পুরোহিত, সেনানী, গুপ্তচর ইত্যাদিরা রাজাকে সাহায্য করতেন।

রাজ্য যত বড় হয়েছে রাজার ক্ষমতা তত বেড়েছে, রাজপদ হয়েছে বংশানুক্রমিক। রাজকর্মচারীর সংখ্যাও ক্রমে বেড়েছে।

এদেশে এসে এখানকার মানুষের সাহায্য নিয়ে যাযাবর আর্যরা স্থায়ী

বসতি গড়লেন এবং চাষ আবাদও শুরু করলেন। চাষের কাজ প্রধানত করত বিজিত অর্থাৎ দাসরা। ক্রমে ক্রমে সমাজের প্রয়োজনে এল কর্মকার (কামার), কুম্ভকার (কুমোর), সূত্রধর (ছুতোর), চর্মকার (মুচি) ইত্যাদি। সমাজে কেউ অস্পৃশ্য ছিলনা, কোন কাজ ঘৃণ্য ছিলনা। আর পেশা অনুযায়ীই মানুষের পরিচয় হত।

আস্তে আস্তে এল ব্যবসা বাণিজ্য। নদীপথেই মূলত: বাণিজ্য হত। সুতরাং নদীর পাড়ে গড়ে উঠল নতুন বসতি বা বাণিজ্য কেন্দ্র। এল মুদ্রা—নিষ্ক, পল ইত্যাদি। গরু দিয়ে সম্পত্তির পরিমাপ করা হত। কারণ গরু দিয়ে বেচা কেনা করা যেত। ফলে গরু হল মূল্যবান সম্পদ। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দেখতে দেখতে গ্রামীন সভ্যতা নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হতে লাগল। সমাজেও এল এক নতুন শ্রেণী—বৈশ্য শ্রেণী।

চতুরাশ্রম

আর্যরা যে অনার্যদের থেকে আলাদা সেটা বোঝাবার জন্য আর্যদের জন্য তৈরী হল চতুরাশ্রম প্রথা। এদের প্রথম হল–ব্রহ্মচর্য প্রথা—(গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করা)। দ্বিতীয় ছিল–গার্হস্থ্য, অর্থাৎ সংসার জীবন যাপন করা। তৃতীয় ছিল -- বানপ্রস্থ—সংসার সম্বন্ধে নিরাসক্ত হয়ে দেবতার সাধনা ভজনা করা এবং চতুর্থ প্রথা হল-- সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসার জীবন ত্যাগ করে ভগবানের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করা। তবে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই বিশেষ চতুরাশ্রমের এইসব নিয়ম পালন করতে পারতেন না।

পুরষশাসিত সমাজ হলেও ঋক্‌বেদের যুগে মেয়েদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা লেখাপড়ার সুযোগ পেতেন। কোন পর্দা প্রথা ছিলনা। সতীদাহ ছিলনা। বাল্য বিবাহও প্রচলিত ছিলনা। এই যুগেই বিশ্বেবরা, অপালা, ঘোষা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা ও গার্গীর মত অনেক অসাধারণ মহিলাদের নাম পাওয়া গেছে। তবে এদের সংখ্যা সত্যিই খুব কম ছিল। সাধারণ মানুষের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীনভাবে সচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ ছিলনা, সে ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক।

আর্যরা মূর্তি পূজায় বা গাছপালা পূজোয় বিশ্বাস করতেন না। ধর্মের প্রধান দিক ছিল যাগযজ্ঞ করা। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তাঁরা দেবতা

বলে কল্পনা করতেন। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অগ্নি প্রমুখ দেবতারা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনে নানা প্রথা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে পড়েছে।

● মহাকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারত ●

বৈদিক যুগের শেষের দিকে আমাদের দেশে রচিত হল দুটি মহাকাব্য— রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণের রচয়িতা ছিলেন মহাকবি বাল্মিকী। আর মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি বেদব্যাস। আর্য ঋষিরা কিন্তু লিখতে পারতেন না। সুতরাং বেদ, উপনিষদ বা রামায়ণ-মহাভারত তখন কিন্তু সবটা মুখে মুখেই চলত। লেখা হল গুপ্তযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর পরে।

রামায়ণ, মহাভারত ইতিহাস নয়। কিন্তু এমন সুন্দরভাবে ইতিহাস, সমসাময়িক আর কোন লেখা পড়ে বোঝা যায় না। রাজার ক্ষমতা কেমন ছিল, সারা ভারতে আর্য ক্ষমতার বিস্তার কিভাবে হল, তখনকার শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল, জাতিভেদ প্রথা ছিল কিনা, মেয়েদের সমাজে ও রাষ্ট্রে কতখানি অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল, আর্যপূর্ব ও আর্য সভ্যতা কিভাবে পরস্পর মিলে মিশে গেল—এর অনেক খবরই আমরা পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। তাই আমাদের প্রাচীনকালের ইতিহাস জানার জন্য এ দুটি মহাকাব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

● জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ●

বৈদিক যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও ধর্মজীবনে বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠল। কৃষিতে পরিবর্তন এল। শিল্প এবং বানিজ্য সমাজ ও অর্থনীতিকে পাল্টে দিল। সমাজে নতুন নতুন শ্রেণী দেখা দিল। এই নতুন শ্রেণী বিন্যাসকে পুরোনো ক্ষমতাশালীরা ভয় পেলেন। ফলে সমাজে ধর্মীয় জটিলতা বাড়ল। সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। জাতিভেদ প্রথা মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে দিল। স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণের অধিকার কমে এল। ধর্মের সব দায়িত্ব

প্রতিবাদী আন্দোলন

নিলেন ব্রাহ্মণ, পুরোহিতরা। এ পরিবর্তন বহু মানুষকেই অসন্তুষ্ট করল। কেউ কেউ তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এমনকি, বেদ ব্রাহ্মণেও অবিশ্বাস করলেন। এরা হলেন আজীবক ও চার্বাক পন্থী সন্ন্যাসীরা। তবে এরা কোন নতুন পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। মানুষের মুক্তির অন্য পথের সন্ধান পাওয়া গেল দুই মহামানবের মধ্যে। নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন—মহাবীর জৈন এবং গৌতম বুদ্ধ। তাদের প্রচারিত ধর্মই জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম।

'জিন' কথার অর্থ বিজয়ী। জিন থেকেই জৈন কথাটি এসেছে। মহাবীর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এর আগে আরও চব্বিশজন তীর্থঙ্করের (সত্যদ্রষ্টা) নাম পাওয়া যায়।

মহাবীর খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি

মহাবীর

মানুষের মুক্তির জন্য ত্রিরত্ন ঃ সৎ-বিশ্বাস, সৎ-আচরণ ও সৎ-জ্ঞান পালনের কথা কথ্য ভাষায় প্রচার করেন। এ ধর্মের মূলকথা অহিংসা, জীবে দয়া ও ইন্দ্রিয় জয়। এ ধর্মে পশুবলি ও জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান নেই। এছাড়া, চুরি না করা, সত্য কথা, বলা, সন্ন্যাস গ্রহণ ও সমস্ত রকম আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া ধর্মের প্রধান কথা।



মহাবীর জৈন

যাঁরা খুব কঠোরভাবে ঐ ধর্মকে মেনে চলেন তাঁরা হলেন দিগম্বর। আর যাঁরা সহজভাবে ঐ ধর্মকে পালন করেন তাঁরা হলেন শ্বেতাম্বর। প্রথমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে ঐ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। আবার, ঐ ধর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য ও মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দেয়। ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণীও ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(মহাবীরের উপদেশগুলি অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র নামে পরে লিপিবদ্ধ করা হয়)।

গৌতম বুদ্ধ

সিদ্ধার্থ বা গৌতম আনুমানিক ৫৬৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কপিলাবস্তুতে ক্ষত্রিয় শাক্য বংশে জন্মেছিলেন। পুরোনো সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর নানা জিজ্ঞাসা ও অসন্তোষ থেকে তিনি সংসার ত্যাগ করে সত্য অনুসন্ধানের জন্য সাধনা শুরু করেন। বেদব্রাহ্মণে তাঁর অবিশ্বাস জন্মেছে। জাতিভেদ প্রথা এবং প্রচলিত ধর্মাচারণকে তিনি মনুষ্যত্বের অপমান বলে মনে করেছেন। মানুষের মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পেলেন—এই যে সত্য বা জ্ঞান তার নামই 'বোধ'—অর্থাৎ তিনি 'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্ত হলেন এবং তার প্রচারিত ধর্মের নাম হল বৌদ্ধ ধর্ম।



গৌতম বুদ্ধ

সহজ সরল ভাবে মানুষের কথা বলার ভাষা পালি ও প্রাকৃতে তিনি ধর্ম প্রচার করলেন। যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনা এবং শরীরকে কষ্ট দিয়ে সাধনা—কোনটার উপরই বুদ্ধদেবের আস্থা ছিল না।

তিনি মনে করতেন, মানুষ দুঃখ পায় আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না বলে। সুতরাং, আকাঙ্খাকে জয় করতে পারলে **নির্বাণ** বা মুক্তি লাভ হবে। আর এই মুক্তি লাভ সম্ভব—সম্যক দৃষ্টি, সৎকর্ম, সদ্বাক্য, সৎ সংকল্প, সৎচেষ্টা, সৎ জীবন, সৎস্মৃতি এবং সম্যক সমাধি—এই সৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুসরণ করে। যাগযজ্ঞ, পূজোপার্বনের ঘটা নয়, মন্ত্র তন্ত্রের জটিলতা নয়, জাতিভেদ প্রথার অপমান নয়, সহজ সরল ভাবে মানুষের প্রতি প্রেম ও সর্বজীবে সমতা—এই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা।

বৌদ্ধ মঠ বা সংঘগুলোও তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালাবার কথা বলতেন। সংঘগুলো শুধু ধর্মচর্চা নয় লেখাপড়ারও জায়গা ছিল। আর সংঘে প্রবেশের অধিকার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষেরই ছিল।

মেয়েরাও সংঘের সদস্যা হতে পারত।

বৌদ্ধ ধর্মের কথা যে বইয়ে লেখা ছিল তাকে বলে 'ত্রিপিটক'—বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক।

● মৌর্য বংশ ●

ভারতবর্ষের প্রথম বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন মৌর্য সম্রাটরা—চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার এবং অশোক। সময়টা আনুমানিক ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ।

তবে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস এর আগেই শুরু হয়েছে। আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের শেষ পর্বে অনেক বড় বড় জনপদ গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অবন্তী, বৎস, কাশী, কোশল, মগধ, কুরু, পাঞ্চাল, লিচ্ছবি প্রভৃতি। এরকম ছোট বড় মোট ষোলটি রাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক রাজ্যের নাম এ সময় পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলো লিচ্ছবির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করে। পারস্পরিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মগধই বড় সাম্রাজ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ও মগধ রাজাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং মহাপদ্মনন্দ।

ষোড়শ মহাজনপদ

আবার, এই সময়ই প্রথমে পারসিক ও পরে গ্রীক আক্রমণ হয় ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজান্ডার উত্তর পশ্চিম ভারত জয় করে তাঁর প্রতিনিধিদের রেখে দেশে ফিরে যান। এ সব অঞ্চলে শুরু হয় গ্রীকদের লুঠতরাজ ও অত্যাচার।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দকে পরাস্ত করে বিশাল নন্দ সাম্রাজ্য দখল করেন। তারপর পর পর দুবার অভিযান করে তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। এভাবে ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করে তিনি প্রায় সমস্ত ভারতব্যাপী এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রাচীন ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যই ছিল সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য।

চন্দ্রগুপ্ত

ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা ও আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পরে গ্রীকদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য ৩০৫-৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। বিন্দুসারের নেতৃত্বে মৌর্য সেনাবাহিনী এ

আক্রমণকে প্রতিহত করে। এ যুদ্ধের ফলে চন্দ্রগুপ্তর সাম্রাজ্য ভারতের বাইরে বাকট্রিয় রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। সেলুকাসের সঙ্গে মৈত্রীস্বরূপ মেগাস্থিনিস রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাটলিপুত্রে আসেন। মেগাস্থিনিসের লেখা ইণ্ডিকা বই ঐ যুগের অনেক তথ্য আমাদের জানতে সাহায্য করে। চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্য এ যুগে অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। মৌর্য যুগের ইতিহাস জানার জন্য এটিই সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ।

বিন্দুসার সিংহাসনে বসে পিতার সাম্রাজ্যকেই দক্ষতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। নানা দেশের দার্শনিকরা আসতেন তার রাজসভায়। তিনি তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর রাজসভায় সমস্ত ধর্মের লোকেরাই সমান সমাদর পেতেন।

বিন্দুসারের পুত্র অশোক ধর্ম সম্বন্ধে একেবারেই যে গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন তাতে মনে হয় তাঁর পিতার অনেকখানি প্রভাব ছিল।

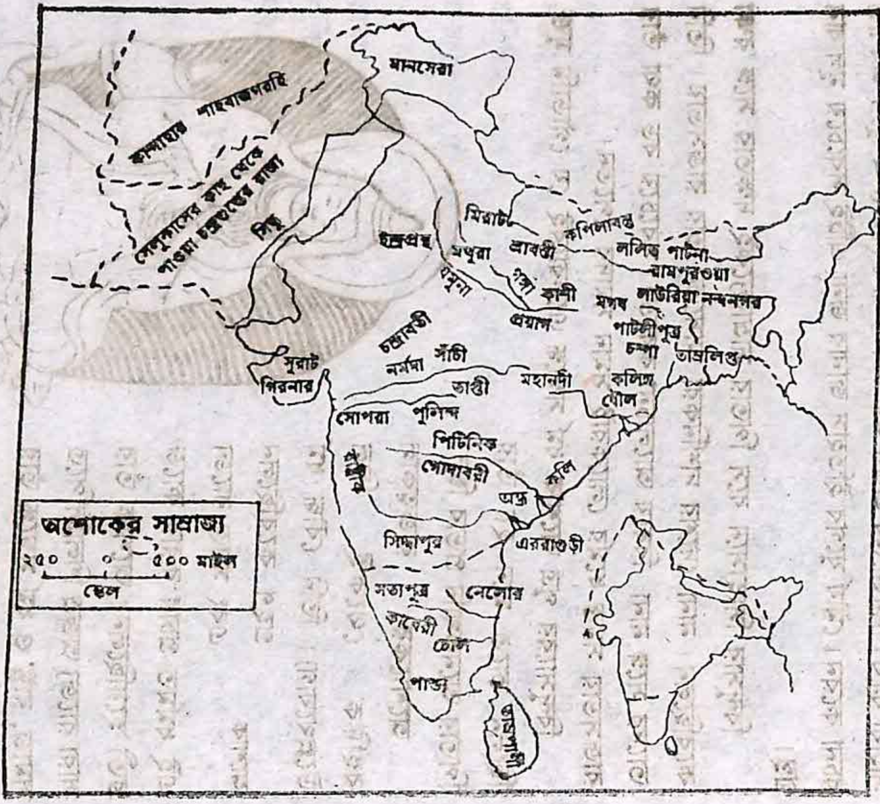
অশোক

অশোকের রাজত্বকাল বহুদিক থেকেই ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত রাজ্যে এই ধর্মমত প্রচার করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। অশোক তাঁর সারা রাজ্যে অজস্র শিলালিপিতে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি প্রায় ৩৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন।



সম্রাট অশোক

তিনি স্বাধীন কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। বহু ক্ষয়ক্ষতির



অশোকের সাম্রাজ্য
২৫০ ০ ৫০০ মাইল
স্কেল
মানসেরা
শাহবাজগরহি
কন্দাহার
সেলুকাসের কাছ থেকে পাওয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য
সিন্ধু
মিরাট
কপিলাবস্তু
ললিত পাটনা
রামপুরওয়া
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
শ্রাবস্তী
গঙ্গা
কাশী
মগধ
লাউরিয়া নন্দনগর
যমুনা
প্রয়াগ
পাটলীপুত্র
চম্পা
তাম্রলিপ্ত
চন্দ্রাবতী
সাঁচী
নর্মদা
মহানদী
কলিঙ্গ
তাপ্তী
ধৌল
সুরাট
গিরনার
সোপরা
পুলিন্দ
পিটিনিক
গোদাবরী
কলি
অন্ধ্র
এররাগুড়ী
সিদ্ধাপুর
সত্যপুত্র
নেলোর
কাবেরী
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী

পর তাকে রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করার পর তিনি ঘোষণা করেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই এবং তিনি যুদ্ধ নীতির পরিবর্তে ধর্ম নীতি ঘোষণা করেন। অশোকের এই ধর্ম একেবারেই মানবধর্ম। অশোক একজন সম্রাট যিনি বলেছিলেন, 'সমস্ত প্রজা আমার সন্তান তুল্য'। 'প্রজার কাছে আমার ঋণ আমি পরিশোধ করব প্রজাকল্যাণ করে।' তিনি আরও বলেছিলেন "অপরের ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা যায় না।" অশোকের এই চিন্তাগুলো যে কোন যুগেই অনুসরণ করার মত।



সিংহমূর্তি (অশোক চক্র)

এ কথা ঠিক যে, মৌর্য রাজতন্ত্র স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল। সুতরাং, অশোকও একজন স্বৈরাচারী রাজাই ছিলেন। তবুও তিনি প্রজা কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সবস্তরের প্রজা সাধারণ এ কল্যাণের সুযোগ সুবিধা পায়নি। কারণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে কখনই সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয় না। তবুও এই নতুন ধরনের ভাবনা চিন্তার সঙ্গে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সঙ্গে মেলাবার যে চেষ্টা অশোক করেছিলেন—এ জন্যই তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



অশোক স্তম্ভের বৃষ

অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্য মাত্র ৫০ বছর টিকে ছিল।

● কুষাণ বংশ ●

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হল। উত্তর ভারত এবং মধ্য দক্ষিণ ভারতে ছোট বড় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। রাজা খারবেলের নেতৃত্বে কলিঙ্গ স্বাধীন হল। উদয়গিরি, খন্ডগিরি হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে খারবেলের কৃতিত্বের কথা লেখা আছে। মধ্য ভারতে স্থানীয় শক্তির নেতৃত্বে বিরাট সাতবাহন সাম্রাজ্য তৈরি হল। যার উল্লেখযোগ্য রাজারা হলেন প্রথম সাতকর্ণী, গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণী ইত্যাদি। এদের ইতিহাস জানা যায় নানাঘাট শিলালিপি, নাসিক প্রশস্তি ইত্যাদি এবং এ রাজ্যে পাওয়া অজস্র মুদ্রা থেকে। ঐ উল্লেখযোগ্য লিপিগুলো লিখিয়েছিলেন প্রথম সাতকর্ণীর স্ত্রী নয়নিকা এবং গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণীর মা গৌতমী বলশ্রী। রাজাদের পরিচয়ের সঙ্গে মায়ের নাম এখানে যুক্ত, যদিও সমাজ মাতৃতান্ত্রিক নয়। তবে অন্যসব রাজবংশের চেয়ে কিছুটা অন্যরকম তো বটেই।

এই সময় কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ভারতে না থাকায় একাধিক বিদেশী শক্তি ভারত আক্রমন করে। একাধিক বিদেশী যেমন ব্যাকট্রিয়ান, শক, কুষাণ, পহ্লব ইত্যাদি। এদের মধ্যে কুষাণ শক্তি এবং কুষাণদের মধ্যে সম্রাট কণিষ্ক ভারত ইতিহাসে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন।



সম্রাট কণিষ্ক (মস্তকবিহীন)

পশ্চিম চীনের ইউচি নামে যাযাবর জাতি থেকে ক্রমাগত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কুষাণরা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং পরে ব্যাকট্রিয় অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করে। এদের প্রথম দুজন রাজা—প্রথম কদফিসেস এবং বিম কদফিসেস। রাজ্য বিস্তারের লোভ এবং

অর্থনৈতিক সুবিধের জন্য এরা ভারতবর্ষেও সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এদের পরই সম্রাট হলেন কণিষ্ক। কণিষ্ক সম্ভবত ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর। তিনি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেনারস, বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। মূলত মধ্য এশিয়ায় তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

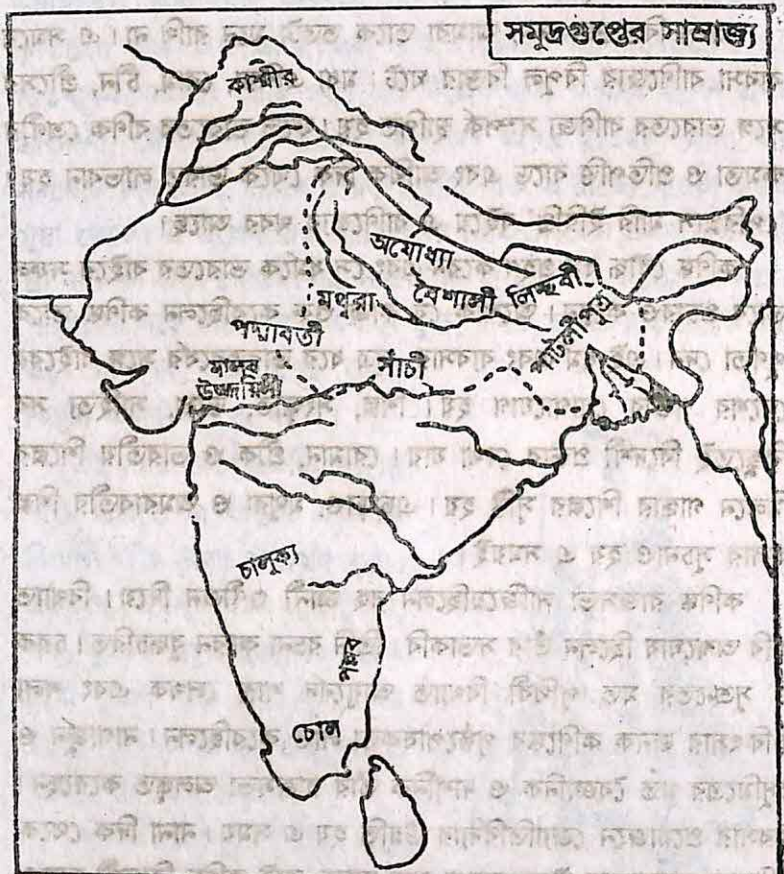
রাজ্য বিস্তারের জন্য আমরা তাকে ততটা মনে রাখি না। এ সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটে। মধ্য এশিয়া, রোম, চীন, গ্রীসের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে ভারতের বণিক শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ে এবং আর্থিক দিক থেকে ভারত লাভবান হয়। 'পেরিপ্লাস মারি ইরিথ্রি' বইয়ে এ বাণিজ্যের খবর আছে।

কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে ধর্মকে ভারতের বাইরে সফল ভাবে প্রচারও করেন। অশোক যে কাজ শুরু করেছিলেন কণিষ্ক তাকে পূর্ণতা দেন। এই ধর্ম এবং ব্যবসার সূত্র ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাইরের দেশের গভীর যোগাযোগ হয়। শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য সব কিছুতেই বিদেশী প্রভাব দেখা যায়। রোমান, গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের মিলনে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও, মথুরা ও অমরাবতীর শিল্প কলার সূচনাও হয় এ সময়ই।

কণিষ্ক রাজসভা সাজিয়েছিলেন বহু জ্ঞানী গুণীজন দিয়ে। বিখ্যাত কবি অশ্বঘোষ ছিলেন তাঁর সভাকবি। তিনি রচনা করেন বুদ্ধচরিত। চরক ও সুশ্রুতের মত পৃথিবী বিখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লেখক এবং শল্য চিকিৎসার জনক কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। নাগার্জুন ও বসুমিত্রের মত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছেন। ব্যবসার প্রয়োজনে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি হয় এ সময়। নানা দিক থেকে কণিষ্কের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে, তাই কণিষ্ক বিদেশী হয়েও ভারতের ইতিহাসে মর্যাদার আসন পেয়েছেন।

● গুপ্ত বংশ ●

ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ভারতীয় শক্তিগুলো মৌর্য যুগ থেকেই দেখে আসছে। কয়েকশো বছরের টালমাটাল রাজনীতির পর গুপ্ত সম্রাটরা আবার ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য তৈরি করতে সচেষ্ট হলেন।



সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য

কিছুটা সাফল্যও লাভ করলেন, তবে আর্যাবর্ত অঞ্চলেই তাদের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ রইল। দক্ষিণ ভারতে অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করলেও তাকে ধরে রাখতে পারলেন না; কারণ এতদিনে দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক চেতনা ও রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

গুপ্ত রাজ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজারা হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত।** বহু ঘটনায় ভরা এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেনের এলাহাবাদ প্রশস্তি, ভিতরি শিলালিপি, এ যুগের অজস্র মুদ্রা, জমির দানপত্র, ধর্ম শাস্ত্র, ধর্ম সংহিতা ও কালিদাসের মহাকাব্য সমূহ থেকে এ যুগের ইতিহাস জানা যায়।



মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদন ছবি



মুদ্রা

৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও মগধকে নিয়ে এই সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে পরাস্ত করে আর্যাবর্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি দক্ষিণ ভারত অভিযান করে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের বারোজন রাজাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু কুটনৈতিক বুদ্ধি দেখিয়ে তাদের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি কোন কোন

সমুদ্রগুপ্ত

রাজার রাজকন্যাকে বিবাহ করেও রাজ্যকে শক্তিশালী করেন। নৌ বাহিনীও তিনি গঠন্ করেন। তিনি বুঝেছিলেন, উত্তর ভারত থেকে আর দক্ষিণাঞ্চল শাসন করা সম্ভব হবে না।

' সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলোকে চিরদিনের মত ধ্বংস করে দেন, যদিও তিনি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের দৌহিত্র ছিলেন বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মা কুমারদেবী ছিলেন লিচ্ছবি বংশের কন্যা।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শকদের ভারতের দক্ষিণে যে আধিপত্য ছিল তার অবসান ঘটান। সমুদ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বাংলারও বহু অঞ্চল নিজেদের দখলে আনেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী দুই জায়গায়। এই যুগেই মধ্য এশিয়া থেকে বিদেশী হুণ আক্রমণ গুপ্তদের অস্তিত্বকে প্রায় বিপন্ন করে দেয়। স্কন্দগুপ্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই আক্রমণকে দীর্ঘদিন প্রতিহত করতে পারলেও, রাজত্বের শেষ ভাগে হুণরা বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মত ভারতে ঢুকে পড়ে এবং পাটলীপুত্র পর্যন্ত দখল করে নেয়। হুণ আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত গুপ্তদের পতন ঘটে। এ যুগ ভারত ইতিহাসে শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, কাব্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

● প্রাচীন বঙ্গদেশ ●

প্রাচীনকালে আজকের মত বাংলা বলে কোন একটা জায়গা ছিল না। সে সময় বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। উত্তবঙ্গে ছিল পুন্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গাল ও সমতট অঞ্চল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চল নিয়ে ছিল গৌড় রাজ্য। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মনে হয়, গঙ্গা ও ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা।

প্রাচীন ইতিহাস

গৌড়ের উল্লেখ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। সেখানে গৌড়ের শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের কথা বলা হয়েছে। বাৎসায়নের রচনায় গৌড়ের মানুষের বিলাস ব্যসনের কথা বলা হয়েছে।

নদীনালাই বাংলার প্রাণ। গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, কোশী এরকম আরও কত নদনদী।

উত্তর ভারতে যখন বড় বড় কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন চলেছে যেমন মৌর্য বা গুপ্ত, তখন বাংলার নানান জনপদ তাদের পদানত হয়েছে। আবার সুযোগ পেলেই বাংলা স্বাধীন হয়েছে।

এরকম ভাবেই একদিন গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রথমে বঙ্গ, তারপর গৌড় স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মহাসামন্ত শশাঙ্ক'র নেতৃত্বে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড় বঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা হল। শশাঙ্কর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ নগরের উপকণ্ঠে রক্তমৃতিকা বিহারে। তাই কর্ণসুবর্ণ এখানেই ছিল বলে ধরা হয়। এই আমলে বাংলাদেশ প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল।

শশাঙ্ক

প্রাচীন বাংলার ধনদৌলত আসত প্রধানত কৃষি থেকে। কৃষকরা সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণী বলে পরিচিত ছিল। ধান, সরষে, আখ আর নানান ফলমূল হোত বাংলাদেশে। নদী নালার দেশ বলে ভাত, মাছ খাবার রেওয়াজ ছিল বাংলার মানুষের।

নানান খনিজ যেমন সোনা, হীরে, রূপো পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের কত জনপদ ও নদীর নাম সোন দিয়ে, তার হিসেব রাখা যায় না।

কাপড়--বিশেষ করে রেশম, **কার্পাস** ও অন্যান্য বস্ত্রের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল। বাংলার মসলিন তো ছিল পৃথিবী বিখ্যাত।

ব্যবসা বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ছিল **তাম্রলিপ্ত** বন্দর। তেজপাতা, পিপুল ও বস্ত্রের ব্যবসায়ে বাংলার খুব লাভ হত। জিনিস দিয়ে জিনিস কেনা এবং পরে মুদ্রারও প্রচলন হয় বাংলায়। গন্ডক, কাকনিক নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অনেক রূপো ও তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে বেড়াচাঁপা, রাজশাহী, মৈমনসিংহ, মেদিনীপুর ও ঢাকাতে। ঐ সব মুদ্রার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার মুদ্রারও মিল ছিল কারণ সারা ভারতের সঙ্গে স্থল ও জলপথে বাংলার বাণিজ্য চলত।

কৃষি ও বাণিজ্য

বাংলার মানুষের সাজসজ্জা, আচার আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান এমনকি,

ধর্মও আজও যেমন আছে প্রাচীনকালেও অনেকটা সেরকমই ছিল। ফলে পুরোনো কালের বাংলাকে চিনতে আজকের বাংলার মানুষের কোন অসুবিধা হয় না।

● ভারতের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক ●

সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল বর্হিজগতের সঙ্গে। সিন্ধু সভ্যতার সময় মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে ভারত বাণিজ্য করেছে এ প্রমাণ আছে তাদের লিখিত তথ্যে এবং তখনকার শীলমোহরে। পারস্য উপসাগরে বাহরিন ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। বাণিজ্য চলত দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলগুলোর সঙ্গেও।

মধ্য এশিয়া, আরব, রোম, চীন, গ্রীস, মালয়, সুমাত্রা, জাভা অঞ্চলের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

ভারতে অনেকগুলো সামুদ্রিক বন্দরের কথাও জানা গেছে। ভারতের বাইরে চীন থেকে ব্যাকট্রিয়া দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে পলেমিয়া পর্যন্ত একটি বাণিজ্য রাস্তার নামই ছিল 'রেশমের রাস্তা'। এ পথে বাণিজ্য ছাড়া সংস্কৃতির আদান-প্রদানও হয়েছে। অশোক থেকে কণিষ্ক পর্যন্ত নানা ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ায়, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় এবং চীনে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেল। গ্রীক ও রোমের শিল্প ধারা ভারতীয় শিল্প ধারার সঙ্গে মিশে গান্ধার শিল্পের জন্ম নিল। সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্যের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বর্হিভারতীয় সংস্কৃতি উন্নত হল।

মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া

চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল গভীর। দুই দেশের মধ্যে সব সময়ই লোক যাতায়াত করেছে। বাণিজ্য, শিল্প, ধর্ম বা পড়াশুনা করার জন্য ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাঙ এদেশে এসেছেন। তারা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থ আমাদের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম, গণিত চীনদেশে সমাদর লাভ করেছে।

চীন

আফগানিস্তানের মানুষের সঙ্গে পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়ায়

ভারতীয়দের খুব মিল ছিল। সেখানকার কোন কোন শহরে বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেখানে অজন্তার মত দেয়াল চিত্র ও বহু সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এখানকার চিত্রে পারসীক শিল্পের প্রভাবও আছে। পারসীক, গ্রীক শিল্পের প্রভাব ভারতীয় শিল্পেও আছে।

আফগানিস্তান

আরব দেশেও ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটে। তবে তা কিছুটা পরের দিকে। এ যোগাযোগগুলো শুরু হয়েছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মকে নিয়ে। পরে তা শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বিদেশের সঙ্গে। বিদেশী আক্রমণও হয়েছে ভারতের মাটিতে বারবার। ভারত কখনও তা প্রতিহত করেছে, কখনও বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এক অসাধারণ ক্ষমতা বলে বহু বিদেশীকে আত্মস্থও করে নিয়েছে। ফলে তারা আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক মিশ্র সংস্কৃতি তৈরী করেছে।

আরব দেশ

● বৈদেশিক বিবরণ ●

সেই প্রাচীনকাল থেকে কত বিদেশী কত কারণে ভারতবর্ষে এসেছেন। কেউ এসেছেন যুদ্ধ করতে, কেউ লেখাপড়া করতে, কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ বা তীর্থ করতে। এদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য রেখে গেছেন।

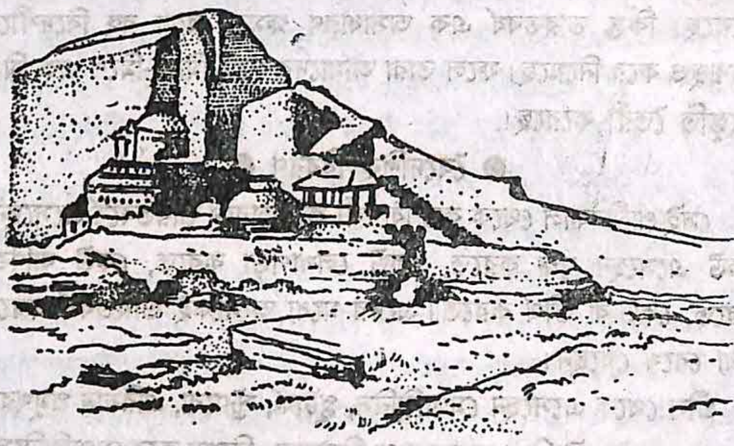
গ্রীস থেকে এসেছেন মেগাস্থিনিস, প্লুটার্ক, স্ট্র্যাবো, এরিয়ান প্রমুখরা। এঁরা প্রত্যেকেই মৌর্য যুগ সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন। বিশেষ করে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন, অর্থনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। বইটি অবশ্য হারিয়ে গেছে, এর কিছু কিছু উদ্ধৃতি আমরা পেয়েছি।

রোম থেকে এসেছেন প্লিনী, এসেছেন টলেমি। তাঁদের লেখায় ভারতের প্রাকৃতিক চেহারা অর্থাৎ ভূগোল এবং অর্থনীতি জানতে পারি। গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস মারি ইরি থ্রি' থেকে ভারতের সঙ্গে বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর পাই।

গুপ্ত যুগে চীন দেশ থেকে আসেন ফা-হিয়েন। তাঁর লেখায় তখনকার ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, দেশের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারি। তবে বিদেশীরা তো আমাদের ভাষা, ধর্ম, জাতিভেদ প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান বুঝতেন না। তাছাড়া, তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন না। ফলে তাদের লেখা অনেকাংশে একপেশে।

● প্রাচীন ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান ●

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে, মৃদু, মন্থর গতিতে। শিক্ষা-দীক্ষা প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে



নালন্দার ধ্বংশাবশেষ

সমাদর পেয়ে এসেছে। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা লিখতে পড়তে জানতেন। আর্য যুগে ছেলেমেয়ে সবাই লেখাপড়া শিখত। পরে অবশ্য লেখাপড়ার অধিকার উচ্চবর্ণের, উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যে এবং প্রধানত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। গুরুগৃহে থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যয়বহুল লেখাপড়া শেখার ক্ষমতা এবং সময় খুব কম মানুষেরই থাকত।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকেন্দ্রগুলো ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। সমস্ত বর্ণের লোকের শিক্ষার অধিকার এই দুই ধর্মে স্বীকৃত ছিল। মৌর্য যুগে তক্ষশীলা, বারাণসী এবং বৈশালীর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খুব নাম ছিল। উজ্জয়িনী, বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য খ্যাত ছিল।

শিক্ষাকেন্দ্র

গুপ্ত যুগের শেষদিকে গড়ে উঠে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, লোকশিক্ষা, শিল্পকলা, চিকিৎসা বিদ্যা এ সবই ছিল অধ্যয়নের বিষয়। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় পড়াশোনা করত।

সাহিত্য, কাব্য ও মহাকাব্য ভারতের সংস্কৃতিকে আরও গৌরবান্বিত করেছে। বেদের মত অসাধারণ গ্রন্থ ভারতীয় ঋষিদেরই কীর্তি। রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্য ভারতেই লেখা হয়েছে। তাছাড়া, সমগ্র প্রাচীন যুগ ধরে রচিত হয়েছে অজস্র ধর্ম-শাস্ত্র, ধর্মসূত্র এবং সংহিতা।

সাহিত্য

মৌর্য যুগে অর্থশাস্ত্রের মত উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করেন সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য। পাণিণির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্যও সেকালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তেমনই কাত্যায়নের আইন গ্রন্থ, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, সর্বোপরি মহাকবি কালিদাসের লেখা রঘুবংশ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুমারসম্ভব , মেঘদূত প্রভৃতি শুধু কাব্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেনি, ভারতের গৌরবও বাড়িয়েছে।

এককালে বাণিজ্যের প্রয়োজনে এদেশে শুরু হয়েছিল গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চা। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা তো সেই প্রাচীন কাল থেকে ভারতে হচ্ছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সংখ্যা গণনে শূন্য'র আবিষ্কার করে গণিতশাস্ত্রে এক বিপ্লব আনলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হল মানুষেরই প্রয়োজনে। যাগযজ্ঞে পশুবলি দিতে দিতে মানুষ একদিন শিখে ফেললেন দেহবিজ্ঞান। যজ্ঞের জায়গা সাজানোর মধ্য দিয়ে জ্যামিতিক বোধ এল মানুষের। আর কুষাণ যুগে চরক, সুশ্রুতের মত বা পরে ধন্বন্তরীর মত চিকিৎসক শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর গর্ব।

গণিত

বিজ্ঞানের অগ্রগতিও প্রাচীন ভারতকে এক গৌরবের আসনে বসিয়েছে। ভূগোল, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচীন ভারত প্রভূত উন্নতি করে। গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। পৃথিবী নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে একথা আর্যভট্টই প্রথম জানিয়েছেন। গুপ্তযুগে গণিতশাস্ত্রে দশমিকের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান

শিল্পকলার বিকাশে মৌর্য থেকে গুপ্ত যুগ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। মৌর্য রাজাদের পাটলীপুত্রের কাঠের রাজপ্রাসাদ দেখে ফা-হিয়েন বিস্মিত হয়েছিলেন। তেমনি বিস্মিত হয়েছিলেন ইলোরার কৈলাশ মন্দির দেখে। অশোকের আমলের বৌদ্ধস্তূপ--সাঁচী, সারনাথ সত্যিই দেখার মত। মৌর্য যুগে পাথরের পালিশ আজও চোখে পড়ার মত। গ্রীক ও পারসিক প্রভাব ছিল এই শিল্পে। গ্রীক ও রোমান প্রভাব ভারতীয় শিল্প রীতির সঙ্গে মিশে তৈরী হল কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্প। এ যুগেই মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পকলাও উল্লেখযোগ্য। তবে স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অপরূপ প্রকাশ দেখা গেল গুপ্ত যুগে। সারনাথ ও নালন্দার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অপূর্ব। অপূর্ব এ যুগের পাথরের মূর্তি। শিল্পে এত সৌন্দর্য ও এত আঙ্গিক সৌষ্ঠব এর আগে দেখা যায়নি। অজন্তার এবং বাগগুহার চিত্রকলা দর্শককে মুগ্ধ করে। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্যও বিস্ময়কর। দক্ষিণ ভারতকে বলা হয় মন্দিরময় দেশ। পল্লব- চোল- চালুক্যদের শিল্প-শোভা প্রশংসা করার মত। বাংলার নিজস্ব পোড়া মাটির শিল্প সত্যিই সুন্দর। শিল্প যে এত জীবন্ত হয়, পাথর যে কথা বলে তা প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা প্রমাণ করে।

শিল্পকলা



মাও ছেলে (অজন্তা চিত্র)

প্রশংসা করার মতই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। তবে এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের যোগ ছিল কতটুকু? আমরা শিল্প দেখে চমৎকৃত হই, কজন শিল্পীর নাম জানি? শিল্পের পরিচয় হয় রাজা-মহারাজার নামে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিও প্রাচীন ভারতে কম ছিল না। কিন্তু তার কতটুকু ভাগ পেয়েছে সাধারণ মানুষ? এ সব কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

● কী শিখলে ●

- প্রাচীন ভারতের আর্য সভ্যতা-লৌহ যুগের সভ্যতা।
- প্রাচীন ভারতের সভ্যতা আর্য, অনার্য হুণ, শক, গ্রীক ও দ্রাবিড়দের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে।
- ঐ সভ্যতাগুলোর মধ্যে প্রথমে বিরোধ থাকলেও ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছে। একে অপরে সমৃদ্ধ হয়েছে। পরে সবাই ভারতীয় সভ্যতায় মিলে গেছে।
- আবার, ভারতে শক, হুণ নানা বিদেশী জাতিও প্রবেশ করেছে যোদ্ধার বেশে, কিন্তু পরে ভারতীয় সভ্যতায় মিশে গেছে। এভাবে ভারতে প্রাচীনকাল থেকে **মিশ্র সংস্কৃতি** গড়ে উঠেছে।
- বেদ, বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য– রামায়ণ ও মহাভারত ও নানান সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈনদের গ্রন্থাবলী, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ, এদেশের পণ্ডিতদের লেখা রচনাবলী (অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি) ভারত ইতিহাসের মূল দিকগুলির পরিচয় দেয়।
- 'আর্য' জাতি নয়—ভাষাগোষ্ঠী। আর্যদের আগমন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে তারা বাইরে থেকে এদেশে এসেছে এটাই পণ্ডিতগণ মনে করেন।
- সমাজের প্রয়োজনে বর্ণভেদ প্রথার সৃষ্টি হোল। মানব সম্পদের শোষণ দেখা দিল। দাস প্রথার প্রচলন ছিল। নারীর মর্যাদা ছিল।
- প্রাচীন সভ্যতায় দান-- অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শল্য চিকিৎসা, শিল্প, বেদ, মহাকাব্য, বহির্বাণিজ্য ও সভ্যতার প্রসার।

- ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ির ফলে প্রতিবাদী ধর্মের জন্ম -- বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। ঐ সব ধর্মে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, অহিংসা ও সমান অধিকার দান।
- সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও দেশের ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা--মৌর্য বংশ, গুপ্ত বংশ ও কুষাণ বংশ।
- ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনও ছিল।
- শশাঙ্কের নেতৃত্বে স্বাধীন বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি।
- ভারত বর্হিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, ধর্ম ও রাজ্য রাজত্বের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশের নানা যোগাযোগ ঘটেছে। গ্রীস দেশ থেকে রোম, মধ্য এশিয়া, দঃ পূঃ এশিয়া, চীন, আরব প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নানা যোগাযোগ হয়েছে।

প্রশ্নপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

● ব্যাবিলন, মিশর, ইরান ও ইহুদি জাতি ●

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ব্যাবিলনীয় সভ্যতাকে উন্নতভাবে গড়ে তোলেন --- ফ্যারাও/হামুরাবি/তৃতীয় থুটমোস/সাইরাস।

(খ) পৃথিবীর প্রথম পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ---হরোপ্পায়/মিশরে/ব্যাবিলনে/থিবস শহরে।

(গ) মিশরে ঘোড়া ও যুদ্ধরথ প্রবর্তন করেছিল --- ফ্যারাও রাজগণ/হিকসস্ জাতি/হামুরাবি/আক্কাদ জাতি।

(ঘ) আমেন হোটেপের অন্যতম লক্ষ্য ছিল --- পুরোহিতদের দমন করা/হিকসস্‌দের পরাজিত করা/উপাসনা পদ্ধতি তুলে দেওয়া/মিশরকে স্বাধীন করা।

(ঙ) যে গ্রীকবীর পারস্যদেশ জয় করেন তিনি হলেন --- সাইরাস/ফ্যারাও/হামুরাবি/আলেকজাণ্ডার।

(চ) ইহুদীরা ইউফ্রেটিস নদীর ধারে বাস করত --- আঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে/আঃ ২৫০০. খ্রীঃ পূর্বাব্দে/আঃ ৫০০. খ্রীঃ পূর্বাব্দে/আঃ ২০০০. খ্রীঃ পূর্বাব্দে।

(ছ) ইতিহাসে হামুরাবি স্মরণীয় হবার কারণ হোল ---

(ক) তিনি খাল কেটে কৃষির উন্নতি করেন।

(খ) তিনি সামরিক শক্তি দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন।

(গ) তিনি এক উন্নত আইন ব্যবস্থা চালু করেন।

(ঘ) তিনি মুদ্রার প্রচলন করেন।

(জ) 'ইরান' নামের প্রধান যুক্তি ছিল---

(ক) ঐ দেশের লোকেরা আর্য শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(খ) ঐ দেশে সাইরাস রাজত্ব করতেন।

(গ) ঐ দেশ আগুনের পূজো করত।

(ঘ) ঐ দেশ বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

(ঝ) লোহা আবিষ্কার হয়েছিল---৮ লক্ষ বছর আগে/দু লক্ষ বছর আগে/সাড়ে তিন লক্ষ বছর আগে/এক হাজার বছর বছর আগে।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সমগ্র মেসোপটেমিয়া কে প্রথম দখল করেন ?
(খ) জিনিসপত্রের কেনাবেচা মেসোপটেমিয়ায় কিভাবে চলত ?
(গ) ব্যাবিলনবাসীরা কয়টা গ্রহের আবিষ্কার করেছিলেন ?
(ঘ) স্থল ও নৌ-যুদ্ধে কোন ফ্যারাও সাফল্যলাভ করেন ?
(ঙ) পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
(চ) জরাথুষ্ট্র কে ছিলেন ?
(ছ) ইহুদিদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
(জ) ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের নাম কি ?
(ঝ) লোহা সর্বপ্রথম কোন দেশের লোক আবিষ্কার করে ?
(ঞ) ঐ যুগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ কাদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল ?
(ট) রাজতন্ত্রের/বড় বড় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সভ্যতার কোন যুগে হয়েছিল ?
(ঠ) হামুরাবি আইনবিধিতে কতকগুলি ধারা ছিল ?
(ড) ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ?
(ঢ) ইহুদিরা কার নেতৃত্বে মিশরে গিয়েছিল ?
(ণ) ইহুদিদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কৃষিতে ব্যাবিলন কিভাবে উন্নতি করেছিল ?
(খ) ব্যাবিলন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কোন দিকে খ্যাতিলাভ করেছিল ?
(গ) মিশরে পুরহিতদের জীবন কেমন ছিল ?
(ঘ) ইহুদিরা কেন মিশরে গিয়েছিল ?
(ঙ) 'এক্সোডাস্' কী ?
(চ) লৌহযুগে কৃষির উন্নতি কেমন হয়েছিল ?
(ছ) হিকসস্‌রা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল কেন ?
(জ) আমেনহোটেপের উদ্দেশ্য ব্যর্থ কেন হয়েছিল ?
(ঝ) ইহুদিরা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কেন ?
(ঞ) ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ব্যবসা বাণিজ্য কেমন ছিল ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) হামুরাবি 'আইন বিধি' ব্যবস্থার মূল কথা কী কী ছিল ?
(খ) সাইরাস ও দরায়ুসের আমলে ইরানের অবস্থা কেমন ছিল ?
(গ) জরাথুষ্ট্রের মূল উপদেশগুলি কী কী ?
(ঘ) ইহুদিরা মিশর ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল কেন ? কিভাবে তারা মিশর থেকে বেরিয়ে আসে ?

(ঙ) ইহুদিরা কীভাবে মুক্তি লাভ করে ?

(চ) লৌহযুগে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার কারণ কী ?

(ছ) মেসোপটেমিয়ায় পূরোহিতদের ক্ষমতা বেড়ে যাবার ফল কী হয়েছিল ?

(জ) তৃতীয় থুটমোস কীভাবে মিশরকে শক্তিশালী করেন ?

(ঝ) মোজেসের দশটি উপদেশ কী ছিল ?

৫। বাঁ পাশের ঘটনা/তারিখকে ডান পাশের ঘটনা/তারিখের সঙ্গে মেলাও ঃ

মেসোপটেমিয়া	-----	ডেভিডের রাজত্বকাল
মিশর	-----	ঈশ্বরের প্রতিনিধি
রাজতন্ত্র	-----	লৌহযুগ
ফ্যারাও	-----	গিলিগামেসের কাহিনী
জেরুজালেম	-----	থিবস

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

● গ্রীস ●

১। বাঁ পাশের শব্দগুলোর সঙ্গে ডান পাশকে মেলাও ঃ

গ্রীস	-----	মিনিয়ান সভ্যতা
ক্রীট	-----	ম্যাসিডন
ইলিয়াড	-----	হেলাস
হেলট	-----	হোমার
দ্বিতীয় ফিলিপ	-----	স্পার্টা

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও ঃ

(ক) ইজিয়ান সভ্যতার লোকেরা --- ও --- র সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত।

(খ) — স্থাপনে গ্রীকদের মধ্যে ঐক্যের ভাব গড়ে তোলে।

(গ) এথেন্সে --- কোন অধিকার ছিল না।

৩। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ

(ক) ঈজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল --- ক্রীটে/এথেন্সে/স্পার্টায়/ম্যাসিডনে।

(খ) 'ওডিসি' মহাকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ---

-- আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনী।

-- ওডিসিয়াসের দেশভ্রমণের কাহিনী।

-- স্পার্টার কঠিন জীবন-যাপনের কাহিনী।

-- এথেন্সের উন্নতির কাহিনী।

অলিম্পিক খেলা হোত --- চার বছর অন্তর/দু বছর অন্তর/পাঁচ বছর অন্তর /এক বছর অন্তর।

(ঘ) আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা যিনি মেনে নেননি তিনি হলেন — দ্বিতীয় ফিলিপ/পুরু/সক্রেটিস/প্লুটো।

৪। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস কিসের উপর ভিত্তি করে রচিত হোত ?

(খ) গ্রীসে রাজাকে শাসনকাজে কারা সাহায্য করত ?

(গ) গ্রীক সমাজে জনসাধারণ কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?

(ঘ) এথেন্সে/স্পার্টায় কি ধরণের শাসনব্যবস্থা ছিল ?

(ঙ) স্পার্টায় কত বছর বয়সে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল ?

(চ) পেলোপনেশীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে শুরু হয়েছিল ?

(ছ) 'ইতিহাসের জনক' কাকে বলা হয় ?

(জ) আলেকজাণ্ডার কোথায় মারা যান ?

(ঙ) পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যের মূল বক্তব্য কী?

(খ) অলিম্পিক উৎসব কী ?

(গ) স্পার্টায় হেলটদের অবস্থা কেমন ছিল ?

(ঘ) পেরিক্লিসের যুগকে অতি উন্নতির যুগ বলা হয় কেন?

(ঙ) গ্রীসের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল কেন ?

(চ) সক্রেটিসের মূল বক্তব্য কী ছিল ?

৬। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ইজিয়ান সভ্যতার অবদান কী কী ?

(খ) গ্রীকদের সমাজজীবন কেমন ছিল ?

(গ) গ্রীসের রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল ?

(ঘ) এথেন্সের লেখাপড়া ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দাও।

(ঙ) স্পার্টার জীবনযাত্রা কী ধরনের ছিল ?

(চ) গ্রীসের 'পেরিক্লিস' যুগের মণীষীদের অবদান কী কী ?

(ছ) পেলোপনেশীয় যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল ?

(জ) এথেন্সে শিল্প ও সাহিত্যের কীরকম উন্নতি হয়েছিল ?

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

● রোম ●

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

(ক) রোম শহরের নামকরণ হয়েছিল ---

আলেকজাণ্ডারের নাম অনুসারে।

রোমুলাসের নাম অনুসারে।

পেরিক্লিসের নাম অনুসারে।

পুরুর নাম অনুসারে।

(খ) রোমে রাজাকে নির্বাচন করত --- সৈন্যদল/ পাদরী শ্রেণী/ সিনেট/ পরিবার।

(গ) কার্থেজ নগরীর পত্তন করেছিল --- ব্যাবিলনবাসীরা/ ট্রয় বাসীরা/ ফিনিসীয়রা/ গ্রীকরা।

(ঘ) ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হল ---

জমির অধিকার না পাওয়া।

অধিক করের বোঝা।

নিষ্ঠুর দাসত্ব থেকে মুক্তি।

রোমের শাসনভার দখল করা।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কখন রোমের প্রতিষ্ঠা হয় ?

(খ) রোম সমাজের ভিত্তি কী ছিল ?

(গ) আদি অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কী ছিল ?

(ঘ) প্যাট্রিসিয়ান বলতে কাদের বোঝায় ?

(ঙ) হ্যানিবলের পরাজয়ের কী ফল হয়েছিল ?

(চ) পিউনিক যুদ্ধ কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘটেছিল ?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধের কারণ কী ?

(খ) জুলিয়াস সীজারের ভূমিকা কী ছিল ?

(গ) স্পার্টাকাস বিদ্রোহ করেছিলেন কেন ?

(ঘ) স্পার্টাকাস বিদ্রোহ করেছিলেন কেন ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রাচীন কালে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস কিরূপ ছিল ?

(খ) রোমে ক্রীতদাসদের জীবনব্যবস্থা কেমন ছিল ?

(গ) অগাষ্টাস সীজারের আমলে রোমের কী ধরনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল ?

(ঘ) খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে রোমে ছড়িয়ে পড়ে ?

(ঙ) কার্থেজের শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে ঘটেছিল ?

(চ) জুলিয়াস সীজারের কৃতিত্ব লিখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

● চীন ●

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) চীনে সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করেন — জুলিয়াস সীজার/শাঙ বংশ/টি-আঙ/চৌ বংশ।

খ) চীনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন — সক্রেটিস/হোমার/অগাষ্টাস/কনফুসিয়াস।

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) শাঙ যুগের লোকেরা কোন ধাতুর জিনিস ব্যবহার করত ?

খ) চীনের প্রাচীর কে নির্মাণ করেন ?

৩। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) চীনের প্রাচীর পৃথিবীতে বিখ্যাত কেন ?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) সাং যুগে চীনের জীবনযাত্রা কী রকম ছিল ?

খ) চৌ বংশের অবদান কী কী ?

গ) কনফুসিয়াসের মূল বাণীগুলি বর্ণনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

● প্রাচীন ভারত ●

১। সময় অনুসারে সাজাও ঃ

গৌতম বুদ্ধ, ঋকবেদ, মহাভারত, হীনযান, অশোক।

২। বাম দিকের ঘটনা ও ব্যক্তির সঙ্গে ডানদিককে মিলিয়ে লিখ ঃ

উপনিষদ	মেগাস্থিনিস
মহাবীর	কনিষ্ক
ইন্ডিকা	শকারি
কুষান	জৈনধর্ম
বিক্রমাদিত্য	আর্য
ফা হিয়েন	চীন

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক) সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলা হোত — পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলকে।
পাঞ্জাব ও রাজস্থান অঞ্চলকে।
পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলকে।
পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলকে।

খ) ইণ্ডিকা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন — ব্যাসদেব/বাল্মিকী/বুদ্ধদেব/মেগাস্থিনিস।

গ) বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূল কথা ছিল —

জাতিভেদ প্রথা মেনে চলা।
হিংসা ও হানাহানি করা।
বেদকে মেনে চলা।
সবাইকে সমানভাবে ভালবাসা ও অহিংসা।

ঘ) কলিঙ্গ যুদ্ধের অন্যতম ফলাফল হোল —

সম্রাট অশোক সিংহাসন ত্যাগ করেন।
তিনি আরও সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন।
তিনি মেগাস্থিনিসকে সভাকবি করেন।
তিনি ধর্ম ও অহিংসার বাণী প্রচারে মন দেন।

ঙ) বিক্রমাদিত্যকে গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলার প্রধান যুক্তি হোল —

তিনি গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।
তিনি আলেকজান্ডারকে পরাজিত করেন।
তিনি প্রসিদ্ধ বিজেতা ও জ্ঞানীগুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
তিনি শকুন্তলা নাটক লেখেন।

চ) আর্যভট্ট প্রথম প্রচার করেন — সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।
চাঁদ সূর্যের চারপাশে ঘুরছে।
চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।

৪। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) আর্যরা কতদিন আগে ভারতে এসেছিলেন ?
খ) বেদের অপর নাম কী ছিল ?
গ) আর্য সমাজের মূদ্রার কী নাম ছিল ?
ঘ) গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম কী ?
ঙ) ত্রিপিটক কাকে বলা হয় ?
চ) নন্দ বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন ?
ছ) গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
জ) অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন ?
ঝ) তাম্রলিপ্ত কী জন্য বিখ্যাত ছিল ?
ঞ) শূন্য/দশমিকের আবিষ্কার কোন যুগে হয়েছিল ?
ট) শকাব্দ কে প্রচলন করেন ?
ঠ) কুষানরা কোন জাতির লোক ছিলেন ?
ড) শশাঙ্ক কে ছিলেন ?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

ক) আর্য সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলা হয় কেন ?

খ) সভা/সমিতি/গ্রামনী/বিশপতি কাকে বলে ?

গ) প্রাচীন ভারতের বড় বড় জনপদগুলি কী কী ?

ঘ) জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কেন উৎপত্তি হয়েছিল ?

ঙ) বুদ্ধদেবের মূল আটটি নীতি কী কী ?

চ) 'ইন্ডিকা'র গুরুত্ব কোথায় ?

ছ) বিক্রমাদিত্যকে 'শকারি' বলা হয় কেন ?

জ) গান্ধার শিল্প কি ?

ঝ) নালন্দা কী জন্য বিখ্যাত ছিল ?

ঞ) ধন্বন্তরি/সুশ্রুত/বরাহমিহির/ব্রহ্মগুপ্ত কে ছিলেন ?

ট) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ভারতের যোগাযোগের কী ফল হয়েছিল?

৬। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) আর্যদের আদি বসতি কোথায় ?

খ) আর্যদের সমাজজীবনে চতুরাশ্রমের প্রভাব কী ছিল ?

গ) আর্যসমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল ?

ঘ) বৈদিক সাহিত্য ও বেদ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

ঙ) বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল কেন ?

চ) আর্যদের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল ?

ছ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে মহাকাব্য কীভাবে সাহায্য করে ?

জ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে মগধকে শক্তিশালী করেন?

ঝ) সম্রাট অশোককে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলার যুক্তি কোথায় ?

ঞ) সম্রাট কনিষ্কের অবদান কী কী ?

ট) সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কীভাবে গুপ্তবংশকে দৃঢ় করেন ?

ঠ) প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাস কেমন ছিল ?

ড) মেগাস্থিনিস/ফা হিয়েনের বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

ঢ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্য/বিজ্ঞানে/শিল্পে অবদান কী কী ?

সময়পঞ্জী

	আঃ খৃঃ পূঃ	
	২০০ কোটি বছর	পৃথিবীর জন্ম
	২৫-২০ লক্ষ বছর	আদি অস্ট্রালোপিথেকাস্
বরফের যুগ	১০ " "	উন্নত অস্ট্রালোপিথেকাস্
	৫ " "	পিথেকানথ্রপাস (জাভা মানুষ), হাইডেলবার্গ মানুষ,(জার্মানী)
পুরানো পাথরের যুগ	৩ " " ●	সিনানথ্রপাস (পিকিং মানুষ)
	১ " "	(আগুনের আবিষ্কার, গুহাচিত্র, যুথবদ্ধতা)
মধ্য প্রস্তর যুগ	৪০-২০ হাজার বছর ●	হোমোসাপিয়েনস্ (ক্রো-ম্যাগনান মানুষ (ফ্রান্স), (আধুনিক মানুষ) নিয়ানডারথাল মানুষ (জার্মানী, মধ্যএশিয়া)।
নতুন	৮ হাজার " ●	কৃষি, পশুপালন, চাকা, ভাষা, লিপি, বর্ণমালা ইত্যাদি।
পাথরের যুগ	৪ হাজার " ●	নদীমাতৃক সভ্যতা- মেসোপটেমিয়া, চীন, (লিপি, ভাষা ইত্যাদি)
তামার যুগ	৩,৫০৫ "	মিশর
	৩ হাজার " ●	সুমের সভ্যতা, ফ্যারাওদের সাম্রাজ্য সূচনা, সিন্ধু সভ্যতা, চীনে সাম্রাজ্য।
তামা-ব্রোঞ্জের যুগ	২৯০০ শ বছর	পিরামিড, স্ফিংস্
	২৫০০-২২০০ শ বছর ●	ক্রীটে ঈজিয়ান সভ্যতা, চীন সভ্যতা
	২১০০ শ " ●	ব্যাবিলনের সভ্যতা- হামুরাবি, ইরান- জরাথুষ্ট।
	১৮০০ শ "	ইহুদিদের মিশরে আগমন, হিকসস্‌দের মিশর দখল (ঘোড়ার ব্যবহার)।
লোহার যুগ	১৫০০ শ " ●	আর্যদের ভারতে আগমন, ঘোড়ার ব্যবহার, লোহা, রোমে প্রজাতন্ত্র।
	১৪০০ শ "	ফ্যারাওদের ক্ষমতা দখল, তৃতীয় থুটমোস

১৩৭৫ শ	„	ইখনাটন
● ১৩০০/১২০০ শ	„	ঋকবেদ, ইহুদিদের মিশর ত্যাগ, মোজেস, গ্রীকদের ট্রয় যুদ্ধ, ক্রীট দখল, আসিরীয় জাতি কর্তৃক ব্যাবিলন দখল, নিনেভ শহরে কিউনিফর্ম লিপি, ২০,০০০ বই
১০০০-৯৬০	„	ডেভিড ও সলোমন, গ্রীসে নগর রাষ্ট্র, ফিনিশীয় সমৃদ্ধি (টায়ার শহর।
৯০০ শ	„	হোমারের যুগ
৮০০ শ	„	কার্থেজের প্রতিষ্ঠা
৭৭৬		গ্রীসে অলিম্পিক উৎসব
● ৭৫৩		রোমের প্রতিষ্ঠা
● ৬০৪		সম্রাট নেবুকাডনেজার ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পুনরুদ্ধার।
৫৬৬		গৌতম বুদ্ধ
৫৫০		কনফুসিয়াস্, সম্রাট সাইরাস (ইরানে সাম্রাজ্য)।
৫৪০		মহাবীর জৈন।
● ৫৩৮		পারস্য কর্তৃক মেসোপটেমিয়া দখল
● ৫২৫		পারস্য কর্তৃক মিশর দখল
৫১০		রোমে গণতন্ত্র
৪৯৪		পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের যুদ্ধ
৪৯০		গ্রীক ও পারস্যের যুদ্ধ, ম্যারাথন যুদ্ধ,পেডেপিডাসের ম্যারাথন দৌড়।
৪৮৪		হেরোডোটাস
৪৬৯		সক্রেটিস
● ৪৬৬		পেরিক্লিস ও এথেন্সের সভ্যতা
৪৩১		এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ (পেলোপনেশীয় যুদ্ধ)
● ৪০৪		এথেন্সের পতন- স্পার্টার জয়লাভ
● ৩৩৮		ম্যাসিডনের ক্ষমতা বৃদ্ধি- গ্রীসের পরাজয়।
৩৩৬		আলেকজাণ্ডার ও পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা
● ৩৩০-৩২৯		আলেকজান্ডারের পারস্য দখল। আরাবেলার যুদ্ধ।
৩২৭		আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ।
২৬৪		রোম ও কার্থেজের মধ্যে পিউনিক যুদ্ধ।
২২০/২১৩		চীনে শি-হুয়াংতি (চীনের মহাপ্রাচীর)।
● ২০০/১৫০		রোমের গ্রীস দখল।
● ১৪৬		রোমের কার্থেজ দখল।
৭৪		রোমে ক্রীতদাস ব্যবস্থার প্রসার।
৭৩		ক্রীতদাস নেতা স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ
৪৪		জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু।
৩১		অগাষ্টাস সীজার-রোম সাম্রাজ্যের উন্নতি।

—০ খৃষ্টাব্দ---

১	যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব, চীনে দাস বিদ্রোহ
৩০৬	কনস্ট্যানটাইনের পূর্ব রোম সাম্রাজ্য স্থাপন
৩১৩	রোমে খ্রীষ্ট ধর্মের স্বীকৃতি
● ৪৭৬	গথ, ভ্যান্ডাল, কৃষ্ণ হুণ, প্রভৃতি বর্বর জাতিদের ক্রমাগত আক্রমন ও রোমের পতন।

ভারত

আঃ খৃঃ পূঃ		সময়পঞ্জী
প্রাগৈতিহাসিক যুগ		
তামা-ব্রোঞ্জের যুগ–	৩৫০০/৩০০০	সিন্ধু সভ্যতা (মহেঞ্জোদাড়ে ও হরোপ্পা) *
লোহার যুগ —	১৫০০	আর্যদের ভারতে আগমন
	১৩০০/১২০০	ঋকবেদ
	৬০০	ষোড়শ মহাজনপদ (রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র)
	৫৬৬	বুদ্ধদেব
	৫৪৪	মগধের উত্থান- বিম্বিসার
	৫৪০	মহাবীর জৈন
	৪০০/৩৭৫	নন্দ বংশ
	৩২৭	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
	৩৩২-৩০০	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, মেগাস্থিনিস।
	২৭৩/২৬১-২৩১	অশোক
	২০০/১৮৭	শুঙ্গ বংশ, মৌর্য বংশের পতন
খৃঃ অব্দ	৭৮/১২০	সম্রাট কণিষ্ক, শকাব্দের প্রচলন
"	৩৩০/৩২০-৩৮০/৩৭৬	সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, গুপ্ত সাম্রাজ্য
"	৩৭৬/৩৮০-৪১৩/৪১৫	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
"	৪০৫/৪০১-৪১১/৪১০	ফাহিয়েনের ভরত ভ্রমণ
"	৪৫৫	স্কন্দগুপ্ত ও শ্বেত হুণ আক্রমণ
"	৪৭৭	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।
"	৬০৩/৬০৬-৬৩৭	শশাঙ্ক
"	৬০৯-৬৪২	দ্বিতীয় পুলকেশী (চালুক্য)
"	* ৫০০০ (মতান্তরে)	সিন্ধু সভ্যতা
"	*৩৫০০/২৫০০(মতান্তরে)	আর্যদের ভারত আগমন
"	১৪০০ (মতান্তরে)	রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য।

মূল্য : ১৪.০০ টাকা

51554

নং ······························ইতিহাস/ষষ্ঠ/৯৭